Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

Satabarsher Choukath Periya Bharatiya Jadu

শতবর্ষের চৌকাঠ পেরিয়ে ভারতীয় যাদু

Khondeker Dilshad Haque
University of Calcutta, Women's Studies Research Centre
1, Reformatory Street, Kolkata-700027, West Bengal, India

ABSTRACT

The term 'Magic' is originated from Greak word 'Mageia' .A time was when magicians were associated with devil and occult from social point of view. Though the performance of magic and its practice is historical and very ancient .This art started to become evident during 18th century in India and eventually the nation would present some distinct magicians in later years .The profession of illusionist gained strength worldwide from 18th century onward and has enjoyed several popular vogues since. In Indian context magicians were often considered to be worker of legitimate mystical miracles not simply an entertainer in ancient period.

West Bengal, Kerala, Karnataka and other parts of India have produced few great magicians like Prof. Bhagyanath, P.C. Sorkar, Chell but for past 100 years Sorkar family has mesmerized countless with their repertoire of tricks. Rope trick , Indian basket or Street magic got popularity regionally. Nowadays this ancient form of entertainment losing its demand and importance with rise of digital and tech-based need of entertainment. But Magic has the unlimited potential and capacity for creative remix if being patronage by state

KEY WORDS: Art, Miracle, Entertainment, Mageia, Illusionist

Article

শিশু, কিশোর, বৃদ্ধের নির্ভেজাল মনোরঞ্জনের খোরাক যোগাতে আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন এক মাধ্যম যাদু। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত সেই বিখ্যাত ছবির বিখ্যাত দৃশ্য আজও আপামর দর্শককুলকে মোহিত করে তোলে। হীরক রাজার দরবার, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন রাজ রাজারা ও জ্ঞানীগুনী শিল্পীরা। বর্ষপূর্তি আয়োজন করা হয়েছে মহা সমারোহে। এসেছেন বিভিন্ন প্রদেশের তাবৎ যাদুশিল্পী ও গাইয়ে বাজিয়েরা। অনুষ্ঠান সূচনা পর্বে এক এক প্রদেশের শিল্পীরা প্রদর্শন করে চলেছেন তাদের কলাকৌশল। কিন্তু সকলে যে দুই জুটির খেলা দেখে বিমোহিত হয়ে 'সাধু সাধু' বলে উঠলেন তারা আর কেউ নয় শুণ্ডিরাজর দুই জামাই গুপি গাইন ও বাঘা বাইন।[১] চোখের নিমেষে হাততালি বাজিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কিংবা যেমনখুশি তেমন সাজ-এর বদল দেখে উপস্থিত সকলে তখন বিস্মিত ও যারপরনায় চমৎকৃত। এমন বিরল যাদুর নিদর্শন তাঁরা কেউই কোনদিন দেখেননি। এমন অভিনব যাদুর ছোঁয়ায় মুগ্ধ পুরো রাজসভা। আসলে ভুতের দেওয়া বরের জোরে এমন অলৌকিক প্রদর্শনী সম্ভব হয়েছিল তাদের পক্ষে। যাদু ছিল তাদের সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রেও। গুপী ও বাঘা যখন একসঙ্গে গান ও ঢোলের সুর ধরতেন, তা সরাসরি প্রভাব ফেলত মানুষের স্নায়ুকেন্দ্রে ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনা

তাদের সঙ্গীতবাদ্য চলাকালীন সম্ভব হতনা সাধারণ মানুষের পক্ষে। সত্যজিতের প্রয়োগ গুণে যাদু শিল্পটি এই চলচ্চিত্রে বিশিষ্ট এক মাত্রা পেয়েছিল। নাবালক-সাবালক সকলের কাছে হয়ে উঠেছিল একান্ত আকর্ষণীয়।

এই শিল্পটি দীর্ঘকাল লোকসমাজে খুব অপ্রথাগত বিনোদনী মাধ্যমরূপে উঠে এসেছে ভারতবর্ষে। পেশা হিসাবেও এটি লোকসমাজে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। নেহাত সখ বা শিল্পের প্রতি চরম অনুরাগ থেকে কিছু কিছু ব্যক্তি যাদুকে পেশারূপে গ্রহণ করেছেন আমাদের দেশে। গ্রামেগঞ্জের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে যাদুর একটা বিশেষ ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরে ছিল। সেখানে মেলা বা লোকসংস্কৃতির অনুষঙ্গ রূপ যাদু শিল্পীরা বিশেষ সমাদর পেতেন। খুব স্বল্প মূল্যেই টিকিট কেটে চটের আচ্ছাদন দেওয়া খুপড়ির মত স্বল্পায়তন মঞ্চালয়ের মধ্যে ছেলে বুড়োরা প্রবেশ করত কম পয়সার বিনোদনের টানে। যাদুর খেলা বলতে সাধারণভাবে সেখানে থাকত তাসের খেলা, হাত সাফাই-এর খেলা, বস্তু অদৃশ্য করে দেওয়া, সাধারণ মানের কিছু জাগলিং-এর খেলা। এক গ্রাম হতে অন্যগ্রামে যাদু শিল্পীরা ঘুরে বেড়াতেন অতি সামান্য কিছু অর্থোপার্জনের তাগিদে। বেশভুষায় থাকত না তেমন কোন চাকচিক্য। পুরোনো মলিন শতচ্ছিন্ন একখানি কালো কোট চাপিয়ে মাথায় একখান টুপি লাগিয়ে নিজেকে একটু স্বতন্ত্র করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাতেন এই সব সস্তার যাদুশিল্পীরা। গ্রাম্য সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী তাদের কোনক্রমে টিকে থাকার জীবন। খেলা দেখিয়ে যেটুকু আয় উপার্জন হত তাতে কোনক্রমে দিন গুজরান হয়ে যেত। শিল্পীর মর্যাদা তাঁরা পাননি কোনদিনই। অথচ এই সব শিল্প সম্ভাবনা যদি খানিকটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বদ্যন্যতা পেত, তবে ওইসব শিল্প প্রতিভা আরো বিকশিত হত। তৎকালীন সমাজে ম্যাজিশিয়ান তথা যাদুকর বা বাজিগরদের কুমতলবী এবং বিশেষ কোন অশুভ শক্তির প্রতীক ভাবা হত। তাই সমাজ সংসারে তাদের কেউ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতনা। ম্যাজিক তথা যাদুর চর্চা করত মুষ্টিমেয় কিছু পরিবার। ভারতীয় যাদুর পথিকৃত যিনি, বিশ্বের দরবারে ভারতীয় যাদুকে যিনি উচ্চ মর্যাদা ও শিল্পের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তিনি প্রতুলচন্দ্র সরকার। সংক্ষেপে জগদ্বিখ্যাত পি.সি. সরকার। আগেই বলেছি যাদুকরদের সমাজ তখন কুচক্রী ও অনিষ্টকারী মনে করত। নিখাদ মনোরঞ্জন নয়, তুকতাক এবং যাদুটোনার সাহায্যে পরোক্ষে একজন যাদুকর নাকি যে কোন মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষজনেরা এমনটাই মনে করত। ফলে যাদু শিল্পী বা যাদু শিল্প চর্চাকারী পরিবারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক সংশ্রব গড়ে ওঠেনি সেভাবে। যাদুকরেরা পিশাচসিদ্ধ এবং বিশেষ কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ফলে তাদের নিয়ে একপ্রকার কৌতুহল ও চাপা আতঙ্ক কাজ করত সাধারণ মানুষের মনে। সেই ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তনে যাঁরা অবদান অসামান্য তিনি হলেন প্রতুলচন্দ্র সরকার।

১৯১৩-এর ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভগবান চন্দ্র সরকার এবং কুসুমকামিনী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিল যে শিশুটি, সেদিন কে জানত যে এই শিশুই একদিন হবে ভারতীয় যাদুর অন্যতম ও শক্তিশালী প্রতিভু! বাংলাদেশের টাঙ্গাইলের ছোট্ট গ্রাম আশকপুরে ছোট্ট এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান প্রতুলের জিনে ছিল যাদু। ভগবান চন্দ্রের পরিবারে বংশানুক্রমে ছিল যাদুর চর্চা। বাবা ভগবান চন্দ্র পিতামহ দ্বারকানাথ কিংবা প্রপিতামহ প্রত্যেকেই যুক্ত ছিলেন এই মহাবিদ্যার চর্চায়। কিন্তু নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রতুলের বাবা ভগবান চন্দ্র কখনও প্রকাশ্যমঞ্চে খেলা

দেখাতেন না। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভগবান চন্দ্র জাতীয় মেলায় যোগদান করলেন, কিন্তু এমন একটি বিনোদনী মাধ্যমকে শিল্পসুষমায় উন্নীত করার জন্য পেলেন না একজনও অনুকুল মনোভাবাপন্ন এবং অনুরাগী মানুষ। যাদুর প্রতি তৎকালীন সমাজের এই উদাসীনতা, অনীহা, অনাগ্রহ ক্রমেই ভগবান চন্দ্রকে হতাশ করে তুলেছিল। তিনি এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখার কোন বিকল্প রসদ পাচ্ছিলেন না। অথচ শিল্পটির প্রতি অপরিসীম অনুরাগে তিনি তখন ব্যাকুল শিল্পচর্চার এই প্রাচীন মাধ্যমটিকে বাঁচানোর জন্য। বাবার এই অদম্য ইচ্ছা আর তাগিদকে সম্মান জানাতে এগিয়ে এল ছেলে। এতদিন ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিল্পচর্চার প্রাচীন এই ধারাটি সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার আর অবহেলার শিকার হয়েছে নানাভাবে। প্রতুলচন্দ্র এগিয়ে এলেন তার প্রতিবাদী সত্তাটি নিয়ে। পিতার এই লড়াই-এর কাণ্ডারী হয়ে তিনি ভারতীয় যাদু শিল্পকে এক উন্নত মাত্রায় চিহ্নিত করতে প্রচেষ্ট হলেন। বৌদ্ধতন্ত্রের দশম মহাবিদ্যার সঙ্গে হিন্দুতন্ত্রের দশম মহাবিদ্যার লড়াই-এ কে বেশি শক্তিমান, অলৌকিক শক্তিতে কে কত বেশি পারঙ্গম তা নিয়ে যাদুকে হাতিয়ার করেই ধর্মযুদ্ধ তখন তুঙ্গে।[২] কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মায়াদেবীর আরাধনায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন। প্রতুল চন্দ্রের মনে হয়েছিল সামাজিক অবহেলা আর অবমাননার শিকার এই শিল্পচর্চার ধারাটিকে যে ভাবেই হোক পুনরজ্জীবিত করতে হবে। গণপতি চক্রবর্তী, রাজা বোস, প্রফেসর যতীন সাহা, রয় দ্য মিষ্টিক সহ বেশ কিছু শিল্পী তখন এই শিল্পটিকে কেন্দ্র করেই কিছুটা যশ খ্যাতি ও অর্থ করেছেন। স্বমহিমায় তাঁরা প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে, কৃতী প্রতিভাবান শিল্পীরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিন্তু ম্যাজিককে কেন্দ্র করে তাঁরা কেউই সেই মার্গে পৌঁছাতে পারেননি যে লোককথা এবং লোকগাথায় তাঁরা কিংবদন্তী প্রতিভা রূপে উল্লিখিত হবেন। একজন সম্পূর্ণরূপে পেশাদার যাদু শিল্পী রূপে স্বতন্ত্র কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীয় উপস্থাপন তাঁদের অধরাই থেকে গিয়েছিল। গণপতি চক্রবর্তী কিংবা যতীন সাহাদের মত মানুষ তাই কালের বিবর্তনে ক্রমে হারিয়ে গেছেন। প্রতিকুল সমাজ পরিবেশ তখনও যাদু শিল্পের প্রতি সেই আনুগত্য দেখাতে পারেনি। এমন দিশাহীন প্রেক্ষাপটে সহায়হীন ভবিতব্য জেনেও ভারতীয় যাদু শিল্পের আগামীদিনের কিংবদন্তী যাদুকরের যাদুকেই পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। এমন ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চিতির যাত্রপথের সামিল হওয়ার আহ্বান বোধহয় তার রক্তেই ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণের কাছে অনাবিষ্কৃত এই পেশার জনপ্রিয়তা জনাকীর্ণতা কিছুই নেই, তবু নিরুদ্দেশ পথযাত্রায় নিহিত আছে বিপুল সম্ভাবনা। সেই খনির সন্ধান যদি একবার মেলে জনমানসে তার স্থান আগামি একশ বছরেও অক্ষয় হবে। বাস্তবিকই তাই-ই হল। তাঁর নির্বাচনে তিনি আজ একশ বছর পরও অভ্রান্ত প্রমাণিত।

যাদুর মহান মহিমামণ্ডিত শিল্পকলার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় ঘটল প্রতুল চন্দ্রের হাত ধরে। যাদুর মাহাত্ম্য এমনই যে সেখানে একধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আরাধনা। যাদু সম্রাট প্রতুল চন্দ্র তা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করে গেছেন। শিল্প ও শিল্পীকে চেনার দায়িত্ব জনমানসের। এতদিন আমাদের রুচি সংস্কৃতি মনন সেই চেনার কাজটা যথাযথভাবে করে উঠতে পারেনি এর জন্য শিল্প বা শিল্পী কারুরই দায় বর্তাই না। যাদুর মত এমন মহান ও সুসংবদ্ধ বিনোদনী কলাকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির রসদের সাহায্যে আবিশ্ব চিনিয়ে গেছেন। দিগ্বিজয়ী তার্কিক পণ্ডিতেরা যেমন তাদের ভাবনা ও যুক্তিশাস্ত্রের মূল নির্যাসটি নানা জায়গা ঘুরে প্রচার ও প্রমাণ করে গেছেন ঠিকই তেমনই প্রতুলচন্দ্র মনে করতেন এই বিনোদনী ধারাটির

মাহাত্ম্য বিশ্ব জুড়ে প্রকাশ করতে হবে। ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার উৎকর্ষ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবগত করে গেছেন তিনি। পৃথিবীময় বিছিয়ে দিয়েছেন এই ভারতীয় শিল্পটির উৎকর্ষ। 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো দেহি – এই সবকটি প্রার্থনাই প্রতুল চন্দ্রের জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। শিল্পীর গুণবিচারির আগেই দর্শনধারী আনুকূল্য ছিল তাঁর অবয়ব জুড়ে আবার যশ, খ্যাতি, লক্ষ্মী লাভ করেও নিরহঙ্কারী সদা হাস্যময় বিদ্বান এই মানুষটি লোকসমাজে হয়েছিলেন পরম জনপ্রিয়।

প্রতুলচন্দ্র ছিলেন সুশিক্ষিত। এতদিন যাদুবিদ্যাকে ছলাকলা, মন্ত্রতন্ত্রের অংশ হিসেবেই ভাবা হত। কিন্তু একজন শিল্পী ক্রমে দেখালেন এই মহান কলাটির সঙ্গে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সংযোগ গভীর। এই প্রথম কোন ভারতীয় যাদুকরের অভিজ্ঞতা স্থান পেল দেশীয় সংবাদপত্রের প্রবন্ধে। প্রথম শ্রেণির তৎকালীন দৈনিকগুলি যেমন, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, প্রবাসী বা ক্যালকাটা রিভিউতে নিয়মিত প্রকাশ পায় প্রতুল চন্দ্রের প্রবন্ধ কিংবা তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এই সুবাদে বিদ্বজ্জন মহলে নিয়মিত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন তিনি। এতদিন কোন যাদুকর তার শিল্পকলাকে বা অভিজ্ঞতাকে সংবাদপত্রের শিরোনামে আসার মত পরিসর দিতে পারেননি। প্রতুল চন্দ্র যাদুমঞ্চে পদার্পণ করেই শিক্ষিত জনসমষ্টিকে নতুন ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। অথচ সে যুগে যাদুকে সম্ভ্রমের চোখে তেমন দেখা হতনা। প্রতুলচন্দ্র প্রথম বিদ্বজ্জনদের কাছে শিক্ষিত বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক মনস্ক এক উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিচায়করূপে আবির্ভুত হলেন। এই যাদুকর এমনই যিনি সত্যি মিথ্যের ঊর্দ্ধে উঠে মানুষের বিচার বুদ্ধি যুক্তি শক্তিকে যেন নিয়ন্ত্রণ করে বদলে দিতে পারেন ঘড়ির সময় কিংবা রেল আসার ঠিক আগের মুহূর্তেই নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে রেল লাইন থেকে সরে যেতে পারেন। এই অনুষঙ্গে বলি, তখন ছিল থিয়েটারী যুগ। বাঙলা রঙ্গ মঞ্চগুলোর তখন রমরমা বাজার। কোন যাদু শিল্পী তখন একক প্রচেষ্টায় যাদুর মঞ্চপ্রদর্শনী করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারেননি। গণপতি চক্রবর্তীর মত খ্যাতনামা যাদুকরও তখন প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের একটি অংশ রূপে তাঁর প্রদর্শনী মঞ্চস্থ করতেন। পরবর্তীকাল তিনি অবশ্য গ্রেট বেঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক যাদুর প্রদর্শনী করেছেন কিন্তু তৎকালীন কোন যাদুকরই বিজ্ঞাপনী পোস্টার ছাপিয়ে কিংবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যাদুকে বিপণনের স্বতন্ত্র হাতিয়ার বানিয়ে আলাদা উপস্থাপনা করতে পারেননি। প্রতুল চন্দ্রই প্রথম এসে যাদু মঞ্চকে পূর্ণাঙ্গরূপে এবং একক নেতৃত্বে ব্যবহার করার দুঃসাহস দেখালেন। পূর্বতন যাদু শিল্পীদের প্রত্যেককেই বিনোদনের অন্যান্য অনুষঙ্গের সঙ্গে যাদু প্রদর্শনের জন্য মূল অনুষ্ঠানটির সময়সীমার কিছু অংশ বরাদ্দ করা হত। সেক্ষেত্রে যাদু অনুষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিবেচিত হওয়ার সুযোগ পেতনা। প্রতুল চন্দ্রই প্রথম এই ট্র্যাডিশনটি ভাঙলেন। তৎকালীন মঞ্চশিল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মনোরঞ্জনের এই অভিনব প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত আভিজাত্য আর কৌলিন্যের সঙ্গে পেশ করলেন। থিয়েটার আর নাটকীয় ঘরানার ভাবটুকু তিনি প্রয়োগ করলেন যাদুর মধ্যেও। যাদু যে শুধু নিছক নিষ্প্রাণ কতগুলি কৌশল প্রদর্শন, সেই সনাতনী ধ্যান ধারণা থেকে তিনি বেরিয়ে এসে দেখালেন গতি, ছন্দ, আবহ, আর সংলাপের মধ্য দিয়ে যাদুকেও অন্য মূর্তি দেওয়া যায়, জীবন্ত করে তোলা যায়। তাঁর এই অভিনব প্রয়াসে তিনি নাট্যাভিনয় ও যাদুর খেলাকে সংমিশ্রিত করলেন। এক অভিনব নাটকীয় রূপ পেল এই মায়ার খেলাটি। সাধারণ থিয়েটারের সঙ্গে সপ্তাহের পর সপ্তাহ পাল্লা দিয়ে চলতে থাকল তাঁর একক প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর নাম, হল 'ইন্দ্রজাল'। মূলত প্রধান ইন্দ্রিয় চোখের উপর প্রভাব বিস্তার করে এই মঞ্চকলা। আসলে

পঞ্চইন্দ্রিয়কে ছাপিয়ে দর্শকের, অতীন্দ্রিয়ের উপর সাময়িক যেন কর্তৃত্ব করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করেছিল প্রতুল চন্দ্রের ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শনী। ভারতীয় যাদু মঞ্চের প্রদর্শনীতে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন আবহসংগীত।[৩] পরবর্তিকাল শুরু হয় যাদুর বিষয় উপযোগী দৃশ্যপট তথা পরিবেশ এবং দৃশ্যপটের সঙ্গে সার্যুজ্য বিধান করে মুড, লাইটিং এবং প্রজেকশন। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মেয়েদের মঞ্চ অভিনয়কে ছাড়পত্র দেয়নি। ফলে ভদ্র বাড়ির বাঙালি মেয়েরা তখন মঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ পেতেন না। পুরুষরাই মেয়ের সাজে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতেন। প্রতুল চন্দ্রও তাই বাঙালি মেয়ের অভাবে বিদেশিনী সহশিল্পী এনে যাদু প্রদর্শনী শুরু করলেন। পরবর্তিকালে অবশ্য নিজের স্ত্রী, কন্যা, শ্যালিকা এবং নিকট আত্মীয়দের সহশিল্পী রূপে মঞ্চ উপস্থাপনের দুঃসাহস দেখান তিনি। সরকার পরিবারের সেই ট্রাডিশন আজও অক্ষুন্ন আছে। প্রতুল চন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র প্রদীপ চন্দ্র (জুনিয়ার পি.সি. সরকার) ও তার পরিবার বর্তমানে সদলবদলে যাদুর মঞ্চে উপস্থিত থাকেন সহশিল্পী রূপে। তাঁর বড় মেয়ে মানেকা তো এখন পেশাদার যাদু শিল্পী রূপে মঞ্চে প্রদর্শনী করেন। প্রতুল চন্দ্র অবশ্য যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল আবহের বিরুদ্ধে সাহসী সিদ্ধান্ত। বাংলার যাদু মঞ্চে যাদুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাট্যাভিনয় ও মহিলা সহশিল্পীর প্রবর্তন এক অভিনব এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াস। রক্ষণশীল ঐ জমানায় এই দুঃসাহসিক ও প্রগতিশীল ভাবনার সামাজিক গুরুত্ব আমরা পরবর্তিকালে অনুধাবন করতে পারি কিন্তু সে'যুগের পক্ষে তা ছিল চরম গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। কিন্তু উদারপন্থী, শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত প্রতুল চন্দ্রের মন তাতে এতটুকু টলেনি এবং দমেনি। কালক্রমে বাঙলার যাদুমঞ্চে মেয়েদের সহশিল্পীর ভূমিকায় স্বর্তঃস্ফূর্ত বিচরণের পথ প্রশস্ত করে গেছেন তিনি। তার এই বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা আধুনিক প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

পৃথিবীর কোন যাদুই সম্পূর্ণ নয়। বাস্তবকে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করা এবং অনুধাবন সহজ; অবাস্তবকে দর্শকের কাছে বাস্তব করে তুলতে গেলে চাই সুনিপুণ উপস্থাপন কৌশল। ম্যাজিকের সার্থকতা এখানেই। এ'ক্ষেত্রে বলি মূলধারার যাদু শাস্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে – (১) সরাসরি বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল বা চাতুরির দিক যাতে যুক্তি আছে পূর্ণমাত্রায় আবার ফাঁকির যাবতীয় উপকরণও সেখানে মজুত (২) সেই কৌশলকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার ভঙ্গিমাটি।[৪] যাদুর যান্ত্রিক তথা বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশলটা অর্থ ব্যয় করে তৈরি করে নেওয়া যায় কিংবা অপর কোন যাদু শিল্পীর কাছ থেকে কিনেও নেওয়া যায়। কিন্তু যাদুর ক্রিয়া এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই কৌশলকে সুদক্ষ ভঙ্গিমায় যদি উপস্থাপন করা না যায় তাহলে বিনোদনের রসভঙ্গ হয়। ব্যুৎপন্ন চিন্তক প্রতুল চন্দ্র এই দুই বিভাগেই তার স্বকীয়তা ছাপ রেখেছিলেন। অবাস্তব ধ্যান ধারণাগুলিতে কল্পনার জালবিছিয়ে কী ভাবে মানুষকে সম্মোহিত করতে হয় তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তবে মায়াদেবীর এই আরাধনায় তিনি বারংবার নানা প্রতিকুলতার শিকার হয়েছেন তাঁর পেশামূলক ও সামাজিক জীবনে। কিন্তু সব বাধাকে তিনি একসময় জয় করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরদের মধ্যে নিজের আসন স্থায়ী করে নেন। তাঁর যাদু বিদ্যার উত্তুঙ্গ সাফল্য ও অভিজ্ঞতার কাহিনি থেকেই জানা যায় প্রতুলচন্দ্র যখন কলেজ পাঠরত সেই সময় বিশেষ খ্যাতনামা যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী শহরের সার্কিট হাউসের ময়দানে একবার এলেন তাঁর যাদুর প্রদর্শনী নিয়ে। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে প্রতুলচন্দ্রও গেলেন গণপতির খেলা দেখতে। খেলা দেখে তো তিনি মুগ্ধ। পরদিনই প্রতুচন্দ্র ছুটলেন গণপতির তাঁবুতে। তাঁর

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রতুলচন্দ্র যে যাদুকেই পেশা হিসাবে নিতে চান, এই সংকল্পের কথাও ব্যক্ত করলেন। যাদুকরবৃত্তি পেশা হিসাবে যে সম্মানজনক নয় ভদ্র পরিবার-এর কেউ এই বৃত্তি গ্রহণে আগ্রহী হয়না সে অভিজ্ঞতা গণপতির আছে। ক্ষণিকের উন্মাদনায় কলেজ পড়ুয়া এই ছেলেটির এমন খামখেয়ালি সংকল্পকে গণপতি তাই একেবারেই মদত দিলেন না। বরং প্রতুলচন্দ্রকে তাঁবুতে বসিয়ে সদুপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এমন অনিশ্চিত এবং সংগ্রামী পেশায় কোন ভদ্র বাড়ির শিক্ষিত ছেলে যে আসেনা তাও বোঝালেন। কিন্তু আগেই বলেছি প্রতুলের জিনে আছে যাদু, তাই একরোখা এই যুবকটিকে গণপতি কিছুতেই সংকল্প বিমুখ করতে না পেরে অবশেষে অন্য কৌশল করে বললেন 'এখন রোজ খেলা চলছে তাই এখন ব্যস্ত থাকব তুমি বরং অন্য আর একদিন এসো'। সেইমতো প্রতুল অন্য একদিন সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁবু গুটিয়ে গণপতি সেখান থেকে চলে গেছেন। আসলে প্রতুলচন্দ্রেকে নিরস্ত করার জন্যই তিনি এমন ফন্দি এঁটেছিলেন। গণপতি ওখানকার খেলা সাঙ্গ করে যে খুব দ্রুত ওখান থেকে প্রস্থান করবেন তা তিনি নিজেও জানতেন। তাঁর ধারণা তাঁর অনুপস্থিতিতেই প্রতুলচন্দ্রের ঘাড় থেকে ম্যাজিকের ভূত নেমে যাবে। কিন্তু প্রতুলচন্দ্রও সংকল্পে অনড় এবং অটল। খোঁজ খবর নিয়ে তিনি চলে এলেন গৌরীপুরে এবার সেখানে তাঁবু ফেলেছেন গণপতি চক্রবর্তী। কিছুটা বিব্রত গণপতি তাকে সাগ্রহইে বসালেন এবং প্রতুলচন্দ্রের এই অটল সংকল্প ভাঙনে এক মোক্ষম দাওয়াই দিলেন। গণপতি তাকে বললেন এ'বড় কঠিন সাধনার পথ তাই তোমাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলাম। তবে শোন, 'তোমাকে কিছু নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। বিশুদ্ধ নিরামিষ আহার এবং ত্রিসন্ধ্যা একাগ্রচিত্তে ধ্যান করে যেতে হবে। এই সংযত কৃচ্ছ্রসাধনের পর্ব চলবে পাঁচ বছর। নিষ্ঠাপূর্বক সাত্তিক আহারসহ ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যানের মধ্য দিয়ে এক অভ্যন্তরীন ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ ঘটবে এবং সেই শক্তির বলে যাবতীয় অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলি বাস্তবে ঘটানো সম্ভব হবে। এছাড়া বাকি সব খেলা নিপাট হাত সাফাই ব্যতীত আর কিছু না'।

গণপতি ভেবেছিলেন এই কঠিন কঠোর সংযমের যাপন শুনেই প্রতুলচন্দ্রের ম্যাজিকভূত পালাবে। কিন্তু বাস্তবে তিনি প্রতুলচন্দ্রের পরিত্রাতা হতে পারলেন না। ছেলেটির শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই গণপতি চেয়েছিলেন অনিশ্চিত এই সম্মানহীন বৃত্তিতে যেন প্রতুলচন্দ্র না আসেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটল ঠিক তার উল্টোটি। প্রবল আগ্রহ আর উদ্দীপনাভরে প্রতুলচন্দ্র এই কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন শুরু করলেন। পারিবারিক ভাবে কোন বাধা না এলেও তার এই উদ্ভট খেয়াল নিয়ে কলেজের বন্ধু বান্ধবেরা টিকা টিপ্পনী করা শুরু করল। প্রতুলচন্দ্রের এক বন্ধু হঠাৎ বলে বসল – 'এই সব সাধনা আসলে ভণ্ডামি'। প্রতুলচন্দ্রও তার ক্রোধ, উত্তেজনা সংবরণ করতে না পেরে তাকে বললেন – 'তবে দ্যাখ আমার শক্তি'। 'তোর দুই হাতের তর্জনী দূর থেকে এনে তাদের মাথা সোজাসুজি স্পর্শ করতে পারবি না'। কোন মন্ত্র বলে তিনি সেদিন এই কথাগুলো বলেছিলেন কেন বলেছিলেন তা তিনি নিজেও জানতেন না। যাই হোক বন্ধুটি তো দেখল সে দুই তর্জনীর মাথা দুইখানি পরস্পরকে স্পর্শ করাতে পারছেনা। এপাশে ওপাশে বেঁকে যাচ্ছে। অথচ সে ভেবেছিল এ'আর কি এমন কঠিন কাজ। প্রতুলচন্দ্রও তখন উত্তেজিত ও বিপর্যস্ত। দু'বছরের কম সাধনায় অর্জিত শক্তি সম্বন্ধে তার নিজেরও ধারণা ছিলনা। কিন্তু সেই শক্তি প্রয়োগে তিনি সাফল্য লাভ করলেন। এত স্বল্প সময়ে সাধনার এরূপ অভাবনীয় সাফল্যে প্রতুলচন্দ্র তখন উত্তেজিত

এবং সংযম হারালেন। সাধনার সাফল্যে তার আর পূর্বতন নিষ্ঠা রইল না। একটা বিরাট প্রাপ্তির অবাঞ্ছিত উত্তেজনা ও আত্মসংযম হারোনোই প্রতুলচন্দ্রে পাঁচ বছরের সাধনাকাল ক্ষণস্থায়ী হল। তিনি যদি আরো কিছুকাল এ'রূপ কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হতে পারতেন তাঁর ধারণা তিনি হয়ত সাধনার আরো উচ্চমার্গে পৌঁছাতে পারতেন। এইটুকু শক্তিকে অবলম্বন করে তাঁকে এই উঞ্ছবৃত্তি করে রুজি জোটাতে হতো না। এটি একান্তই তার নিজস্ব অভিমত কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি এই সামান্য শক্তি নিয়ে অক্লেশে বিশ্ব জয় করে গেছেন। চিরজীবন অক্লান্ত সাধনা আর পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তিনি তার শিল্পকলাকে একটা উচ্চতায় নিয়ে গেছিলেন। সেখানে ভারতীয় যাদুবিদ্যাকে বিশ্ববাসী সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে। প্রতুলচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার ম্যাজিক। দৃঢ় কোন সংকল্প থেকে পিছু না হটার ম্যাজিক। সমাজের অবহেলা আর প্রতিবন্ধকতাকে নির্মূল করে দেওয়ার ম্যাজিক।

প্রতুলচন্দ্র নিজেও বলতেন 'আমিও লোক ঠকাই তবে বলে কয়ে ঠকাই'। এটাকে নিশ্চয়ই প্রতারণা বলা যাবেনা। ম্যাজিক তাই হাতের বিভিন্ন মুদ্রা এবং কলাকৌশলের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে আবিষ্ট করার খেলা – নির্মল আনন্দের খেলা। তাই এইরূপ বিনোদনী আঙ্গিকটি হল সম্পূর্ণ রূপে পরিশুদ্ধ এবং নির্ভেজাল চিত্তসুখের উপকরণে ভরপুর। এতে রোমাঞ্চ ও চমক থাকলেও কোন প্রকার প্রতারণার ইঙ্গিত তাতে নেই। মানুষের হৃদয়কে তো বটেই যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে জয় করার যাদু মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন প্রতুলচন্দ্র। তখন ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অধীন ফলে দেশীয় শিল্পীদের কদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করার মত পরিবেশ তখন ছিল না। শিল্প উপস্থাপন কিংবা নানাবিধ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিদেশি শিল্পীদেরই অগ্রাধিকার ছিল সকল ক্ষেত্রে। এ'মত অবস্থায় শহর কলকাতাও ছিল দুটি ভাগে বিভক্ত। এক সাদা চামড়া তথা গোরা ইংরেজদের কলকাতা। আর দুই কালো চামড়ার মানুষ ইংরেজদের ভাষায়, 'নেটিভদের কলকাতা'। নেটিভ কালাআদমি রূপে ভারতবাসীরা তখন ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সুযোগ সুবিধার দিক থেকেও বঞ্চিত। এখন যে প্রেক্ষাগৃহটি নিউ এম্পায়ার নামে পরিচিত সেটিই একসময় ছিল ইংরেজ রাজশক্তির সাহিত্য, সংস্কৃতি মনোরঞ্জনের পীঠস্থান। বিলাসী মনোরঞ্জনের এই সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্রটি দেশীয় মানুষজন সংস্কৃতির প্রদর্শনীর কাজে বিশেষ ব্যবহারের সুযোগই পেতেন না। এই নিউ এম্পায়ারেই দীর্ঘদিন যাবৎ প্রতুলচন্দ্র তাঁর যাদুর প্রদর্শনী করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রতুলচন্দ্রের শো চলেছিল। দেশি বিদেশি সকলেই আমোদিত ও আহলাদিত হলেন তাঁর প্রদর্শনী দেখে। একজন নেটিভ ভারতীয় বিদেশিদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে সেই সময় দেখিয়ে দিলেন তাঁর অনন্য ও ব্যতিক্রমী প্রতিভার নজির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট যাদুকর জনবুথও তাঁর যাদু কৌশলে যারপনাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। একজন যাদুকর যে জনমানসে এত জনপ্রিয় আসন লাভ করেছিলেন তা নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাস করা যায়না। একজন যাদুকর যে মানুষদের কাছে এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন তা তিনি একবাক্যে স্বীকার করেছেন। প্রতিকুল পরিস্থিতি তৈরি করতে এ'সময় ব্রিটিশ রাজশক্তি উঠে পড়ে লাগল। তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তার শিল্প সাম্রাজ্যকে দমন করতে তারা বিদেশি যাদুকরকে মঞ্চে হাজির করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রতুলচন্দ্রের মহিমা আর বিপুল

জনপ্রিয়তাকে খানিকটা কোনঠাসা করে দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। বিদেশ থেকে উড়িয়ে আনা হল পাশ্চাত্যের এক বিশাল মাপের যাদুকর লাইয়েলকে। বিদেশি প্রযোজকদের সহায়তায় তিনি প্রদর্শনী করলেন কলকাতার মঞ্চে।

সেই একই নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল তাঁর খেলা। বেশ কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নিউ এম্পায়ারের থিয়েটার মঞ্চে খেলা দেখালেন যাদুকর লাইয়েল। প্রতুলচন্দ্রও প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর খেলা। বুঝে নিতে চাইলেন যাদুকর লাইয়েলের শক্তি। কে বড় যাদুকর লাইয়েল না পি.সি. সরকার এই নিয়ে শুরু হলো তুল্যমূল্য বিচার। কিন্তু দেশের মাটিতে, দেশের প্রেক্ষাগৃহে দেশীয় জনগণের সামনে অনুকূল বাতাবরণে তো একজন বিদেশি শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে নামটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। সেক্ষেত্রে দেশের মানুষের রায় প্রতুলচন্দ্রের পক্ষেই থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তাই যাচিয়ে নেওয়ার পরীক্ষায় দেশের মাটি তাকে অনেকেটাই সুবিধা দেবে এই ধারণায় এক অঘোষিত লড়াই-এর জন্য প্রতুলচন্দ্র বাছলেন হংকং। সেখানে তাঁকে কেউ চিনবেনা, তাঁর প্রতি দর্শকের স্বাভাবিক কোন দুর্বলতা থাকবে না। আসলে সেই সময় লাইয়েল কলকাতার পর সিঙ্গাপুর হয়ে হংকং-এ খেলা দেখাতে যাবেন। হাতে মাত্র মাস খানেক সময় আছে। এই সময়টা প্রতুলচন্দ্র বাছলেন নিজের প্রস্তুতি পর্বরূপে। বিদেশি শক্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার এই চ্যালেঞ্জকে অনেকেই অসম প্রতিযোগিতার সামিল মনে করল। কারণ অন্যদিকে আবার রয়েছে বিলাতী পণ্যের মত বিলাতী বিনোদনী সংস্কৃতির প্রতি অমোঘ হাতছানি। যা কিছু বিলাতী তাই, উৎকৃষ্ট, তাই উন্নত অর্থাৎ fascination for foreign consumerism এই ধারণা দ্বারা বিনোদনী জগৎও যে বিযুক্ত ছিলনা কথা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে দেশীয় উপরকণ, দেশীয় প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে প্রতুলচন্দ্র কিভাবে বিদেশী শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করে জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করবেন তা নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে। আসলে হংকং যাওয়ার বিপুল ব্যয়ভার বহন এবং প্রযোজনার খরচ তো ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রতুচন্দ্রকে দেবে না, যাদু প্রদর্শনীয় ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকও তখন তেমন কেউ ছিলেন না। বাঙালির যাবতীয় সাংস্কৃতিক আনুগত্য তখন থিয়েটারি চর্চাকে কেন্দ্র করে। প্রতুলচন্দ্রের সংকল্প এবারও অদম্য। তিনি বললেন ‘কাউকে এগিয়ে আসতে হবে না আমিই প্রযোজনা করব আমার নিজের অনুষ্ঠান ‘ইন্দ্রজালকে’। বাড়ি বন্ধক রেখে, সঞ্চয়ের সবটুকু নিঙড়ে নিয়ে হংকং এর প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের ভাড়া মেটালেন। প্রচার পর্ব থেকে শুরু করে যাতায়াত খরচ, লরি বোঝাই মাল পরিবহনের খরচ, সীমান্ত পেরোনোর অনুমতি, তৎকালীন হংকং সরকারের কাছ থেকে ব্যবসায়িক অনুমতি গ্রহণ, ট্যাক্স প্রদান সবই তিনি করলেন একক উদ্যমে ও উদ্যোগে। নির্ধারিত দিনেই হংকং-এর প্রেক্ষাগৃহে শুরু হল যাদুর প্রদর্শনী। প্রতুলচন্দ্রের প্রদর্শনীতে উপচে পড়ছে ভিড়। অথচ লাইয়েল-এর মঞ্চে সেই উপচে পড়া ভিড় নজরে পড়ল না। মানুষ একনজরে চিনে নিলেন ভারতীয় যাদুর হিরকখণ্ডটিকে। তাই নির্দ্বিধায় দর্শক সায় দিলেন প্রতুলচন্দ্রের সমর্থনে। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা জায়গায় অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সেদিন লড়াই-এ জিতে গেলেন প্রতুলচন্দ্র। ভারতীয় ইন্দ্রজালকে সেদিন তিনি বিদেশের মাটিতে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন। প্রতুলচন্দ্রের প্রদর্শনীতে আশ্চর্য জনসমাগমের পরিণামে শেষ পর্যন্ত লাইয়েলের প্রদর্শনীটি বন্ধ হয়ে গেল। নিজের শো বন্ধ করে এইবার লাইয়েল চলে এলেন পি.সি. সরকারের প্রদর্শনী দেখতে। এদিকে দর্শকের উত্তুঙ্গ চাহিদার জেরে প্রতুলচন্দ্রকে শো চালিয়ে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন। লাইয়েল তার চরম প্রতিপক্ষের শক্তির সম্পর্কে কিছুটা ধারণা

পেলেন। বুঝলেন এই প্রবল শক্তির সঙ্গে তিনি শিল্প-সমরে পারবেন না। একে প্রতিহত করতে হবে অন্যপথে। সেই পথ শিল্পীর শোভা পায়না। তবু প্রতুলচন্দ্রের বিজয়রথ ঠেকাতে লাইয়েলরা সেই পথই অবলম্বন করলেন। জনগণের বিপুল ভারসা আর সমর্থন পেলেও পাশ্চাত্যের ককেশিয়ান শত্রুরা প্রতুলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। ভারতবর্ষেও কলকাতাতে তাঁরা প্রতুলচন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য এজেন্ট নিয়োগ করলেন, যাতে তিনি সুষ্ঠভাবে তার প্রদর্শনী না করতে পারেন। এদিকে বিদেশের মাটিতে প্রতুলচন্দ্রের বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি এগিয়ে এলনা প্রযোজকের ভূমিকায়। অথচ প্রতুলচন্দ্র পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলিতেও ওড়াতে চান যাদুর বিজয়কেতন। প্রতুলচন্দ্রের প্রযোজক হয়ে কেউই বিদেশী শক্তির বিরাগভাজন হতে চাইলনা। অগত্যা তিনি আবারও সেই 'একলা চলরে' নীতি গ্রহণ করলেন।

এ বার তাঁর গন্তব্য শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম পীঠভূমি ফ্রান্স। সেখানে প্রবেশ করতেই যাদুকর হেলমুট স্ক্রবারের প্রবল প্রতিহিংসার সম্মুখীন হতে হল প্রতুলচন্দ্রকে। হেলমুটকে সঙ্গ দিলেন ফ্রান্সের যাদুকর কুলও। এককালে এঁরা দুজনেই প্রতুলচন্দ্রের বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। যাদুর বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে তাদের মধ্যে এর আগে একাধিকবার মত বিনিময় পরামর্শ তথা ভাবের আদান প্রদান হয়েছে। তখন অবশ্য প্রতুলচন্দ্র ধরতে পারেননি তাঁদের স্বরূপটি। বন্ধুত্বের মুখোশ পরে এঁরা জানতে চেয়েছিলেন, তাদের পেশার আর এক শিল্পীর ক্ষমতা কতখানি। এঁদের ধারণা ছিল ভারতের মত দরিদ্র দেশের শিল্পী প্রতুলচন্দ্রের ক্ষমতা দেশের আবর্তেই সীমাবদ্ধ। সেই দেশীয় ঘেরাটোপ ভেঙে একজন ভারতীয় শিল্পী যে বিশ্বজয়ে বেরোতে পারেন তা তাঁদের সুদূরতম কল্পনাতেও ছিলনা। শুধু তাই নয় প্রতুলচন্দ্রের বিপুল সমাদর আর জনস্বীকৃতি দেখে নিজেদের শিল্প প্রতিভা ও শক্তি প্রসঙ্গে অনিশ্চিত বোধ করলেন হেলমুট বা কুল। নানা ষড়যন্ত্র, প্রতিরোধ, সমস্যা সৃষ্টি করেও তাঁরা প্রতুলচন্দ্রের এই বিজয়রথকে থামাতে পারেননি। বদনাম ছড়িয়ে, অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটিয়ে নানা প্রকার দুরভিসন্ধি এঁটেও তাঁরা প্রতুলচন্দ্রের প্রদর্শনীর সাফল্য রুখতে পারেননি। লাগাতার আট সপ্তাহ যাবৎ প্যারিসের প্রেক্ষাগৃহে চলল পি. সি. সরকারের যাদু প্রদর্শনী। এবার তাঁর ইন্দ্রজাল মায়া বিস্তার করল জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, রাশিয়া, ইরাক, মিশর, কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, উগান্ডা, জাঞ্জিবারে। কোথাও তাঁর বিজয়রথ থেমে থাকেনি। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে তিনি ইতিহাস রচনা করে গেছেন। শোনা যায় যে অস্ট্রেলিয়ার শো করার ফলে বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান শিল্পী ফলিবার্জের উপার্জনকে পেরিয়ে গেল ভারতীয় ঐন্দ্রজালিকের উপার্জন। জনপ্রিয়তায় তিনি তখন পাশ্চাত্য শিল্পীদের ছাড়িয়ে আরো এক কদম এগিয়ে গেছেন। লাস ভাগাসের অনুষ্ঠানে সেরা শিল্পী বব হোমের সমমূল্যের পারিশ্রমিক পেয়েছিলনে প্রতুলচন্দ্র। যাদু জগতে এমন নজির বিরল যে পাশ্চাত্যের কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সঙ্গে একজন ভারতীয় যাদুকরকে একই আর্থিক মর্যাদা ও সম্মান জানানো হয়েছিল। জাপানের প্রেক্ষাগৃহে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শনীর টিকিট বিক্রির পরিমাণ সেইসময় জাপানের সর্বকালীন রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছিল।

আগেই বলেছি প্রতুলচন্দ্র ছিলেন একজন নিরহঙ্কারী, সদাহাস্যময়, বিনয়ী মানুষ। বাস্তবিকই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমকালীন শিল্পীদের দ্বেষ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, ক্রোধকে জয় করেছিলেন নিজের সম্মোহনী শক্তির গুণে। 'দ্বিষো জহি' কথাটা আজীবন কাল তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর বিদ্যা ও শিল্প প্রতিভার কোন দম্ভ প্রকাশিত হয়নি কোনোদিনই। যাঁরা তাঁকে

আজীবন প্রতিযোগী ও পরম শত্রুর চোখে দেখেছিলেন তাদের মনও তিনি জয় করেছিলেন নিজের চারিত্রিক ঔদার্যের গুণে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যাদু যুদ্ধে কে জয়লাভ করল তার থেকেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তাঁর সাগর প্রমাণ শিল্প-প্রতিভার স্রোত। এ'স্রোতের তোড়ে অনেকে হারিয়ে গিয়েছিল লীন হয়ে গিয়েছিল। বাবা ভগবানচন্দ্র যে লড়াইটা শুরু করেছিলেন পুত্র তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্বমহিমায়। তাঁরই হাত ধরে ভারতীয় যাদু বিশ্বের দরবারে এক বিশিষ্ট ভারতীয় শিল্পের উপমায় জায়গা নিল পাকাপাকি ভাবে। ভারতের এই সুপ্রাচীন বিদ্যাটি দীর্ঘ অবহেলা ও অমর্যদার কারণে প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যাচ্ছিল। প্রতুলচন্দ্র তাকে নবজীবন দান করলেন। জীবনভর সাধনায় তিনি এই ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে নান্দনিক শিল্প কলার স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হন। ম্যাজিকই ছিল যাঁর শ্বাস প্রশ্বাস, ম্যাজিকই ছিল যাঁর আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম তিনি কিন্তু সবসময় বোঝাতে চাইতেন, যাদু কোন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের হাতিয়ার নয়, বরং তা হল বিজ্ঞান ও মঞ্চমায়ার যোগফল। ভারতীয় ম্যাজিককে এক উচ্চতর বিনোদনী আঙ্গিকে পেশ করার ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন প্রতুলচন্দ্র। তার হাতের ছোঁয়ায় যাদু আর সেই সাবেকি ঘরানার সস্তা বিনোদনী খোরাক থাকল না। বিশুদ্ধ বিনোদনী রূপে একটি শিল্পকলাকে তিনি গুণগত ভাবেই শুধু সমৃদ্ধ করে তো গেছেনই পরিমাণগত দিকটার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট নজর ছিল। তাই তিনি যখন, যেমন ভাবে পেরেছেন নিজের দেশি যাদুর ভাণ্ডার নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন নানা দেশে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে। প্রতুলচন্দ্রের প্রদর্শনী দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা সুযোগ বর্তমান প্রজন্মের হাতে নেই। তবে তাঁর প্রদর্শিত খেলাগুলির সম্পর্কে নানাবিধ কাহিনি আজও জনশ্রুতি হয়ে আছে। শোনা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ওল্ড বয়েজ হোমের সভা কক্ষে একবার প্রতুলচন্দ্রের সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি সমিতির আয়োজিত এই সভায় তাঁর নানা অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে শোনাতে হঠাৎই পাঞ্জাবীর পকেট হতে একটি এক টাকার মুদ্রা বার করে তিনি সকলকে একবর পরখ করে নিতে বললেন। মুদ্রাটির মধ্যে কোন কারচুপি আছে কিনা তা দেখে নিতে বললেন। সভাপতি ও অন্যান্য ক'জনের হাতে হাতে ঘুরে মুদ্রাটি পুনরায় ফিরে এল প্রতুলচন্দ্রের হাতে। এরপর তিনি ঝনাৎ করে সজোরে মুদ্রাটি টেবিলে ফেলে পলকে দুহাত মুঠো করে সবাইকে প্রশ্ন করলেন এবার বলুন মুদ্রাটি আমার কোন হাতে আছে। আচমকা এই পট পরিবর্তনে সকলে খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়ল কেউ বলেন বাঁ হাত তো কেউ ডান এ'ভাবে প্রচন্ড কলরবের সৃষ্টি হল। সকলে যখন বিভ্রান্ত তখন যাদুকর তার হাতের মুঠি খুলে দেখালন যে, মুদ্রাটি কোন হাতেই নেই। সবাই তো বিস্ময়ে হতবাক। চমকের আরো বাকি ছিল। এরপর তিনি দেখালেন হারানো মুদ্রাটি টেবিলের উপরেই স্বমহিমায় বিরাজ করছে। সভাগৃহ নিস্তব্ধ বিহ্বল। এবার যাদুকর খেলার মূল রহস্য উন্মোচন করলেন। তিনি দেখালেন মুদ্রাটির একটি বিশেষত্ব আছে যেটি সভায় উপস্থিত সকলের নজর এড়িয়ে গেছে। মুদ্রাটি আসলে কোন সাধারণ মুদ্রা নয় একটি খাঁটি রূপোর মহারানি ভিক্টোরিয়ার মুদ্রা। এই মুদ্রাটি গঠন প্রকৃতি এমনই যে এটিকে আছাড় দিলেই ঝনাৎ করে শব্দ হয়। বিশেষ এই মুদ্রার গঠন ছাড়া এই খেলাটি দেখানো যায় না। যাদুকরের সঙ্গে তাই এমন অনেক জিনিসই মজুত রাখতে হয় যেগুলির সাহায্য ব্যতীত এইরূপ কলা কৌশল প্রদর্শন অসম্ভব। প্রতুলচন্দ্র বোঝালেন যাদুর মূলমন্ত্রই হল কোন দৃশ্যমান বস্তু ও ব্যক্তিকে দর্শকের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য করে দেওয়া আবার মুহূর্তের মধ্যে সেই হারিয়ে যাওয়া বস্তু বা ব্যক্তিটিকে ফিরিয়ে আনা। এই

কৌশলের মধ্যে কোনরূপ তুকতাক বা বুজরুকির যে জায়গা নেই তা তিনি বারে বারে বোঝাতেন। বিজ্ঞান ব্যতীত আলাদা কোন মোড়কে যাদুকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেননি। প্রতুলচন্দ্র সম্পর্কে একটি কাহিনি তো আজ প্রায় মিথে পরিণত হয়েছে। প্রতুলচন্দ্র অনন্য প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়ই এই কাহিনিটি উঠে আসে যে, কোন একবার তিনি বিদেশের মঞ্চে প্রদর্শনী করতে গেছেন। তাঁরই যাদুর আসরে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে তিনি প্রবেশ করলেন। সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে সাহেবরা খুবই শৃঙ্খলিত। এ'হেন সাহেবদের দেশেই বিশ্বখ্যাত যাদুকরের এমন অপেশাদার সুলভ আচরণ দেখে দর্শকরা যারপরনাই বিস্মিত ও অধৈর্যও বটে। বিদেশের পেশাদার মঞ্চশিল্পীরা সময়ের বিষয়টিতে খুবই মনোযোগী। তা এমন একজন খ্যাতনামা শিল্পীর এই বিলম্ব দেখে সকলেই খানিকটা বিরক্তও বটে। কিন্তু বিদেশের দর্শকরা আচরণগতভাবে যথেষ্ট সংযত ও মার্জিত। এ'দেশীয় দর্শকদের মত তারা কিন্তু শিল্পীর সামনে কোনোরূপ অভব্য বা অশিষ্ট আচরণ করেননা। বরং পরদিন সকালের বহুল প্রচারিত পত্র পত্রিকাগুলিতে ফলাও করে প্রকাশিত হবে অভিযুক্ত শিল্পীর নামে সমালোচনা। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হলনা উদ্বেগহীন মুখে, লজ্জাহীন ভঙ্গিমায় দৃপ্ত পদক্ষেপে চিরাচরিত স্মিতহাস্য বদনে যাদুকর মঞ্চে পদার্পণ করলেন। নিজের এই বিলম্বের কারণে কোনরূপ ক্ষমা প্রার্থনা বা লজ্জাভাব প্রকাশও করলেননা। যা সচরাচর শিল্পীরা করেই থাকেন। প্রতীক্ষারত দর্শককুল তখন পারফরমারের এমন আচরণে হতবাক যাদুকর তার স্বাভসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সকলের উদ্দেশে সম্বোধন করে বললেন 'ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আমি কিন্তু ঠিক সময়েই এসেছি। নিজেদের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখুন, এখন ঠিক ৬টাই বাজে। আমিও আপনাদের মতই সময়ানুবর্তী'। সবাই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন তখন ঠিক ৬টা বাজে। এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর পুত্র পি. সি. সরকার (জুনিয়ার) বলেন এটা আসলে সত্য নয় এটা একটা মিথ। একজন ভারতীয় যাদুকরের ক্ষমতা ও প্রতিভার মাত্রা অনুধাবনে এই মিথটি প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে। সত্য এটা যে, তিনি দেশে বিদেশে বারংবার তার অপরিসীম প্রতিভার বলে মিথ্যা কল্পনাকেই সত্যি করে দেখিয়ে গেছেন। বিশ্ববাসী বারংবার মুগ্ধ হয়েছে অসম্ভবের মঞ্চরূপ দেখে। ফল্গুধারার মত ঘটি থেকে 'water of India'-এর অবিশ্রান্ত স্রোত যেমন দর্শক দেখেছেন তার খেলায় তেমনই দেখেছেন মঞ্চের মাঝখানে ধারালো করাতের সাহায্যে একটি নারীকে দু'টুকরো করে আবার তাকে জুড়ে দিচ্ছেন 'গিলি গিলি গে' এই কল্পমন্ত্রের সাহায্যে। তবে তিনি বারংবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কোনো মন্ত্রবলেই কাটা মানুষকে জোড়া যায়না এখানে প্রযুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক কৌশল এবং কিছুটা সাউণ্ড ও লাইট এফেক্ট ।

ম্যাজিক শব্দটির (MAGIC) উৎপত্তি ল্যাটিন 'MAGI' কথাটি হতে। প্রাচীন Zorastrian হতে এটির প্রচলন।[৫] যাদুবিদ্যা তথা সম্মোহন কলা আবহমানকাল প্রাচীন মানব সভ্যতার বিনোদনী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। প্রাচীন যাদুকলায় নানাবিধ উপাদানের সমাহার ছিল। ভ্রম সৃষ্টি অতি কাল্পনিক তথা অবাস্তব ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন কিংবা নানাবিধ মজার দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটানোই প্রাচীন ইন্দ্রজালবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে পরবর্তিকালে নানাভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এই বিদ্যার প্রয়োগ শুরু হয় এবং এই প্রয়োগ অপেক্ষা অপপ্রয়োগ ও অন্য কাজে এই কলাটি ব্যবহারের হদিস পাওয়া যায়। তুকতাক, মন্ত্র কিংবা মিরাকেলের সাহায্যে সামাজিক রোগব্যাধি কিংবা অন্য নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত ভুলভাবে কেবল লোক যাদুর শাস্ত্রীয় অনুশীলন রীতিতে অনেকটা প্রথামাফিক চর্চার সূত্রপাত হয়।

অষ্টদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সময়কালে ভারতীয় সংস্কৃতিতে উঠে আসেন বিশিষ্ট কিছু যাদুকর যারা ভারতীয় বিনোদনী ঘরানাটিকে যাদুর মাধ্যমে অন্য মাত্রায় উন্নীত করেন। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, গুজরাট, দিল্লী, মুম্বাই ও ভারতবর্ষের অপর কিছু প্রান্তে পাওয়া যায় বেশ কিছু প্রসিদ্ধ যাদু শিল্পীর নাম, যাঁরা পরবর্তিকালে ভারতীয় যাদুকে বিশ্বের দরবারে এক বিশিষ্টতা দান করে গেছেন। যাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকারকে তথাপি ভারতীয় যাদুর জনক রূপে মান্যতা দেওয়া হয়। ভারতীয় যাদুর একশ বছরের ইতিহাসে তাঁর অবদান বোধহয় সর্বাধিক। তাঁর সৃষ্ট বিশিষ্ট কিছু খেলা শুধু ভারতীয় যাদুর মঞ্চেই নয় বিশ্ব যাদুর মঞ্চে আজও অনন্যতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। গত ২০১০ এর ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার প্রতুলচন্দ্রের সম্মানার্থে তার চিত্রসহ ডাক টিকিট প্রকাশ করেন।[৬] ভারতীয় যাদুকর হিসাবে রাষ্ট্র কর্তৃক তিনি এই বিরল সম্মানের অধিকারী হয়েছেন প্রায় এক শতক অতিক্রান্ত হওয়ার দোর গোড়ায়। যাদুকর প্রতুলচন্দ্র নতুন একমাত্রায় যাদুর বিনোদনী আঙ্গিককে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও দৃষ্টি নন্দন মাধ্যমের সাহায্যে যে ভাবে উপিস্থাপিত করে গেছেন তাতে যাদুর নেতিবাচক দিকটি সম্পর্কে মানুষের ধ্যানধারণা আমুল বদলে যেতে শুরু করে। অপরাপর রাজ্যের কিছু যাদুপ্রেমী মানুষ এই বিদ্যাকে পেশারূপে গ্রহণে এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন Vazhakunnam Neelakandon Namboothin-একে বলা হত কেরালার যাদু শিল্পের পিতামহ (Grand father of Kerala Magic)।[৭] এছাড়াও অপর একজন ভারতীয় যাদুকরকে এক্ষেত্রে স্মরণ করতেই হয় তিনি নিজে একজন অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষ। তিনি হলেন Prof. K. Bhaganath। তাকে বলা হত 'Most Educated Magician in the world।[৮] ভারতীয় ইন্দ্রজালে প্রতুলচন্দ্রের মত খ্যাতি না পেলেও এঁরাও স্ব, স্ব ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করে গেছেন। গুজরাটেই এক বিশিষ্ট যাদু শিল্পী মহঃ চেল (জন্ম – ১৮৫০, নিঙ্গালা)। পথযাদুকর হিসাবে ইনি গ্রামেগঞ্জে পথে ঘাটে ট্রেনে বাসে যাদু দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন আঞ্চলিক মানুষের কাছে। তিনি কখনও প্রথাগতভাবে প্রদর্শনী মঞ্চে তার যাদুর প্রদর্শনী করতে যাননি। তার প্রদর্শনী মঞ্চ ছিল চলার পথ। দর্শক ছিলেন সাধারণ গ্রামবাসী, পথচলতি মানুষ কিংবা যানবাহনের যাত্রীরা। তবু তিনি এত সাধারণভাবে ম্যাজিক শিল্পটিকে সমাজের খুব নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। ম্যাজিক এর মাধ্যমে তিনি বাস্তব জীবন সংসারের কিছু বার্তা সবসময় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন তাই তার ম্যাজিক শুধু ইন্দ্রজাল বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। জীবনেরও দ্যোতক ছিল তাঁর এই ভ্রাম্যমান বিদ্যাটি। শুধু তাই নয় তিনি তাঁর এই শিল্পটি প্রয়োগ করেছেন সমাজের বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের হিতার্থে।

গুজরাটের অপর এক বিশিষ্ট যাদুকরও ভারতীয় যাদুমঞ্চে সুনামের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। তিনি হলেন কে. লাল। এছাড়া Prof. Chudasama এবং অন্য আরো কয়েকজন শিল্পী প্রাদেশিক ভাবে উঠে এসেছিলেন। ভারতের অন্যতম সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র রূপে যেমন কেরালার সার্কাস শিল্প বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং ভারতের প্রথম সার্কাস স্কুলও প্রথম কেরালাতেই গড়ে ওঠে ঠিক তেমনই ম্যাজিক তথা যাদুকলার চর্চায় কেরালা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কেরালার শ্রী Vazhukunnan Neelakandon এর নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যাকে কেরালার ম্যাজিক শিল্পের 'Grandfather' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন কেরালার এই প্রবাদপ্রতিম শিল্পী। কেরালার

Vaazhakunnath Mana অঞ্চলে তার জন্ম হয়। ম্যাজিকের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মায় Mundaya Fachara Varier প্রদর্শিত কলাকৌশল দেখে। এরপর তিনি এক বিশিষ্ট শিল্পী Kochunni Thampuram এর প্রদর্শনীতে 'Cheppadividy' (Tricks by Pallatheri Nambyathan Namb) দেখে অভিভূত হন এবং যাদুকৌশল শিখবার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন। পরবর্তিকালে তিনি 'Kayyothukkan' কৌশলে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার এই শিল্পকলাটির জন্য তিনি প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেন। যাদুর খেলা ব্যতীত তিনি কখনও সখনও প্রদর্শনীতে পেয়ালা ও বলের খেলাও দেখাতেন। কেরলীয় ভাষায় এই খেলাটিকে বলা হয় 'Cheppum Panthum'। ১৯৪০-এর পর তিনি পেশাগতভাবে তার নিজস্ব দল নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শনী শুরু করেন এবং তাঁর এই দলটি মঞ্চে যাদুর খেলার সঙ্গে নৃত্য, হাস্যকৌতুক এবং ছোট নাটিকাও সংযুক্ত করেছিল।

ভারতীয় সংস্কৃতির অপর এক প্রথিতযশা যাদু শিল্পী হলেন 'Prof. K. Bhagyanath। ভারতীয় যাদুর এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৬ সালে। ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রাপ্ত এই বিশিষ্ট শিল্পীকে 'Most Educated Magician in the World এই আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল।[৯] প্রথাগত উপায়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও Magic ছিল তার প্যাশনের জায়গা। ১৯৬৩ সালে ইনি পেশাগতভাবে যাদুমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং ইন্দ্রজাল বিদ্যার মাধ্যমে দেশবাসী তথা বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইন্দ্রজাল বিদ্যা হল সর্বাধিক সুন্দর শিল্পকলার নিদর্শন। যার মধ্যে শিল্পের প্রতিটি লক্ষণ বিদ্যমান। শুধুমাত্র যাদু বা শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখেই নয় একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী হিসেবে যৌবনে তিনি মহাত্মার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুব নেতৃত্বে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলনে। দীর্ঘাঙ্গী সুপুরুষ Bhagyanath সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। Bhagyanath এর মঞ্চ উপস্থিতিই দর্শককে মাতিয়ে রাখত। ব্যক্তিত্বের গুণে তিনি মঞ্চে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারতেন। অবাস্তব তথা পরাবাস্তব বিষয়গুলির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে যত অভিনব ভঙ্গিমায় মঞ্চ উপস্থাপন করা যায় তা দেখিয়ে গেছেন Bhagyanath এর মত শিল্পীরা। একজন সুশিক্ষিত মানুষ তার শিক্ষা, বুদ্ধি ও মেধা বৈদগ্ধ্যের সাহায্যে ম্যাজিকের আভিজাত্য ও কৌলিন্য বৃদ্ধি করে গেছেন আজীবনকাল। অপরাপর শিল্পীকলা অপেক্ষা যাদুকলা যে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে উন্নত ও বিশিষ্ট বারবারই তিনি তা প্রমাণের চেষ্টা করে গেছেন তার নিরন্তর কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। বর্তমান যাদুর প্রদর্শনীতে যে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও কলাকৌশলের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার প্রচলন শুরু হয়েছিল কিন্তু প্রতুলচন্দ্র কিংবা Bhagyanath এর মত শিল্পীর হাত ধরেই। ম্যাজিকের প্রতি তার অপার অনুরাগ আজীবনকাল Bhagyanath কে এই কলার চর্চায় ব্রতী করেছে। মাত্র বারো বছর বয়স থেকেই প্রথাগত পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের চর্চা শুরু করেন তিনি এবং জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত এই শিল্পের প্রতি উৎসগীর্কৃত প্রাণ ছিলেন। ১৯৯৯-এর ১৫ই জানুয়ারী এই বিশিষ্ট শিল্পী পরলোকগমন করেন। Bhagyanath এর মত শিল্পীর যাদুর সঙ্গে যে শিল্পচেতনা যুক্ত ছিল ভারতীয় যাদুর ইতিহাসে খুব মুষ্টিমেয় শিল্পীই তেমন শৈল্পিক সুষমার যাদুকে উপস্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন। সব থেকে আশ্চর্য একসময় যাদুকে তথাকথিত নিম্নবিত্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষজনের সংস্কৃতির অঙ্গ স্বরূপ মনে করা হত। কিন্তু প্রতুলচন্দ্র কিংবা Prof. Bhagyanath-এর সংস্পর্শে এই শিল্পই একদিন শিক্ষিত ও বিদ্ধৎসমাজের চর্চার ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয় হয়ে ওঠে। প্রতুলচন্দ্র সহ আরো যে দুজন শিল্পীর কথা এখানে উল্লেখ করলাম তাঁরা স্ব স্ব

ক্ষেত্রে কীর্তিমান। এঁরা ছাড়াও বেশ কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় যাদুকরের নাম উল্লেখ করতেই হয় যাঁরা ভারতীয় যাদুর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান দেখে গেছেন। এঁরা হলেন Prof. শঙ্কর এবং শঙ্কর জুনিয়র। তাদের প্রদর্শনীর বিশেষ পরিচয়টি হল 'গিলি গিলি ম্যাজিক'। তাছাড়াও পির মহম্মদ ছেল, অশোক ভাণ্ডারি, গোপিনাথ মুথুকাড, পি.সি. সরকার জুনিয়ার, ফিলিপ তিজু আব্রাহাম, যাদুকর কে.লাল, খুদাবক্স, প্রহ্লাদ আচার্য, পি. জেমস–এর নাম উল্লেখ্য। অতি সাম্প্রতিককালে মহিলা যাদুকর রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন জুনিয়র পি. সি. সরকারের জেষ্ঠ্যা কন্যা মানেকা সরকারও।

বহুরূপে ইন্দ্রজাল – এবার ভারতীয় ম্যাজিকের বেশ কিছু প্রচলিত সাধারণ ক্রীড়াকৌশল প্রসঙ্গ আলোচনা করব। যেগুলি প্রায় প্রতিটি যাদুকর মঞ্চক্রীড়ারূপে প্রয়োগ করতেন। প্রথম যে খেলাটির কথা বলব সেটি হল – দড়ির সাহায্যে খেলা তথা 'Indian Rope trick'। প্রায় উনিশ শতকের সুচনাকাল থেকেই এই কৌশলটি দেখানো শুরু হয়েছিল। এই খেলাটিতে একজন যাদুকর একটি সুদীর্ঘ দড়ি এবং কয়েকজন সহকারী শিল্পীর সাহায্যে খেলা দেখাতেন। এই খেলাটির জনকরূপে ধরা হয় John Elbert Wilkie কে। চিকাগোর এই শিল্পীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তিকালে এই দড়ির খেলাটি প্রদর্শনে শিল্পীরা বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে এই খেলা সাধারণ দর্শকের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। এই খেলাটিকে বলা হত 'The World's greatest illusion'।[১০] এই খেলাটিকে পাশ্চাত্য শিল্পীরা এক ধরণের দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টিকারী মায়াজল প্রদর্শন স্বরূপ মনে করতেন। ১৮৯০-এর পূর্বে এই খেলার সেরূপে কোন অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই ১৮৯০ সালটিকেই Rope trick সুচনার প্রামাণ্য বছর হিসেবে গণ্য করা হয়। এই খেলাটি তিনটে বিশেষ আঙ্গিক থেকে দেখানো হতো। প্রথমতঃ খেলাটির সরলতম রূপ হিসাবে একটি লম্বা দড়ি আলগা ভাবে একটি ঝুড়িতে ফেলে রাখা হত। যাদুকর তাঁর মন্ত্রতন্ত্রের বলে যেন সেই দড়িটি শূন্যে কোন সহায়ক ছাড়াই দাঁড় করিয়ে দেবেন লাঠির মত করে। লাঠির মত সোজা হয়ে থাকা দড়িটিতে তাঁর সহকারী শিল্পী নিচ থেকে বেয়ে সোজা উপরে উঠে যাবেন এবং পুনরায় উপর থেকে নিচে নেমে আসবেন। এই খেলাটির আরো জটিল এবং বিস্তারিত সংস্করনটিতে দেখানো হয় দড়িসহ শিল্পীটি দড়ির আগায় উঠে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান এবং তার অনতিবিলম্বেই দর্শকেরা জমিতে দেখতে পান তাঁকে। এই খেলাটির মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে দড়িটি প্রান্তের কোন সাহায্য ছাড়ায় খাড়া হয়ে থাকে শূন্যে এবং এই খাড়া দড়িটি ধরে সহ শিল্পী সহজেই উপরে উঠে যেতে পারেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সার্কাসেও দড়ির খেলা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। দড়ির তথা ট্রাপিজের বিভিন্ন জটিল খেলায় ভারতীয় সার্কাস শিল্পীরা বিশেষ পারদর্শিতার নজির স্থাপন করে গেছেন। অনুরূপভাবে ভারতীয় যাদুর ক্ষেত্রেও দড়ির এই অভিনব খেলাটি বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই খেলাটিরই অত্যন্ত জটিল আধুনিকতম রূপটি হল দড়িটি পূর্ববত খাড়া হয়ে শূন্যে গগনচুম্বীরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে দড়ির ঊর্দ্ধভাগের শেষ প্রান্তটি জনগণ প্রত্যক্ষ করতেই পারেনা। ঠিক একইভাবে যাদুকরের সহকারী শিল্পী ঐ দড়িতে বেয়ে উচ্চ অবধি উঠে দর্শকের দৃষ্টির গোচর হতে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর যাদুকর খুব নাটকীয় ঢঙে খানিকটা রাগতসুরে তার সহকারীটিকে নেমে আসার জন্য হাকাঁহাকি করতে থাকেন, কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তিটি আর নিচে নেমে আসেনা। যাদুকর তখন নিজেই একটি ছড়ি নিয়ে দড়ি বেয়ে তাকে খুঁজতে ওঠেন এবং নিজেও অদৃশ্য হয়ে যান। এরপর দর্শকয় শূন্যে দুই ব্যক্তির অর্থাৎ যাদুকর এবং তার

সহকারীটির অদৃশ্য অবস্থায় বানাদুবাদ শুনতে পান এবং দেখেন শূন্য হতে যাদুকরের সহশিল্পীটির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাটা অংশ ছুড়ে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। অবশেষে যখন দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ ধরটি মাটিতে ফেলা হয় তার পরেই যাদুকরকে দেখা যায় সেই দড়িটে বেয়ে নিচে নেমে আসতে। তিনি এবার তার সহকারীর বিচ্ছিন্ন হওয়া সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সংগ্রহ করে একটি ঝুড়িতে রাখেন এবং ঝুড়ির মুখটি বন্ধ করে দেন। অনতিবিলম্বেই দেখা যায় ঝুড়ি হতে তার সহযোগী শিল্পীটি অখণ্ড দেহে মঞ্চে আবির্ভুত হন। ভারতীয় দড়ির খেলার এই আঙ্গিকটি একসময় দর্শক মহলে তীব্র উন্মাদনা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় যাদুর দড়ির এই খেলাটির সঙ্গে চায়নার Rope rick এর বিশেষ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। (১২৫৪-১৩২৪) এই সময় মার্কোপোলা তার পর্যটনের অভিজ্ঞতায় ভারতীয় যাদুর, খেলায় এবং চায়নার যাদুর খেলায় 'China Rope Trick' সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতে এসে বিদেশী পর্যটক ইবনবতুতা চায়না ও ভারতীয় সমজাতীয় দড়ির খেলা সম্পর্কে (১৩৪৬) উল্লেখ করেন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে। তাঁরই ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতে চায়নাই রেকর্ড করা এই খেলার জনপ্রিয়তা সম্পর্ক জানা যায়। Pu Songlin-এর 'Strange stories from Chinese, Studio' (1740)[১১] থেকে জানা যায় চায়নার Mwdarin (সরকারী কর্তাব্যক্তি) এর অনুরোধে যাদুকর বিস্ময়করভাবে শীতের সমাপ্তিতেও স্বগীর্য় উদ্যান থেকে যেন পিচ ফলের আমদানী করতে পারেন তাঁর অদ্ভুত যাদুশক্তির বলে। এই খেলার প্রেক্ষাপট অনেকটা এমন যাদুকরের পুত্র দড়ি বেয়ে অনেক উচুঁতে উঠে যান। অদৃশ্য হয়ে যান। অদৃশ্য অবস্থায় পিচ ফলের বর্ষণ হতে থাকে এবং যেন উদ্যানরক্ষী তাকে বন্দী করে ফেলার আগেই তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটি ভূপতিত হয়। এই খেলায় একটু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যরূপে বলা যায় যে, যাদুকর নিজে কিন্তু দড়ি বেয়ে উপরে ওঠেন না। খণ্ড খণ্ড দেহাংশগুলি নিয়ে যাদুকর একটি ঝুড়িতে পুরে রাখেন এবং সরকারি কর্তা ব্যক্তিকে সেই পিচ ফল প্রদানের মাধ্যমে তার মূল্য দাবি করেন। পিচ ফলের মূল্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই ঝুড়ি থেকে তার পুত্র অক্ষত ও জীবন্ত অবস্থায় বেড়িয়ে আসেন। এক্ষেত্রে পুরো খেলাটির মধ্যে একটি কাহিনি ও নাটকীয় উপাদান ভরপুর। Songling এর মতে এই খেলাটি চায়নার 'white lotus society'-এর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ঠিক অনুরূপ প্রকৃতির খেলার নিদর্শন পাওয়া যায় ষোড়ষ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের যুগেও। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় দিল্লী, আগ্রা থেকে শুরু করে ঢাকা, পাটনা এবং বাংলার মুর্শিদাবাদ প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ১৮০০-১৯০০ শতক পর্যন্ত এই সকল স্থানে এই দড়ির খেলাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ব্রিটীশ শাসনকালে ভারতীয় যাদুর ক্ষেত্রে এই কৌশলটি বহুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮৯০ সালে 'Chicago Tribuna' এই খেলাটির উৎস ও প্রবর্তক সম্পর্কে প্রথম তথ্য প্রকাশ করে তাদের পত্রিকায়। তার ঠিক একশ বছর পর ১৯৯২ সালে ভারতীয় যাদুকর, Inshanudheen ও Padmaraj কর্তৃক এই খেলা প্রদর্শনের যথার্থ খবর প্রকাশ করেন BBC। যথার্থ খবর বলার কারণ ১৮৯০ সালে Chicago Tribuna তে এক সাংবাদিক তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে S. Ellmore এই নামে Rope Trick-এর কাহিনিটি বিবৃত করেন এবং সে সময় এ'খবরের সত্যাসত্য সেভাবে আর যাচাই করা হয়নি। তবে বাস্তবে যাদুর বিভিন্ন খেলার সঙ্গে মিথ-এর একটি ঘনঘটা ঘটেছে নানা সময়ে তাই অনেক সময়েই যাদুকর কর্তৃক সত্যিই তেমন খেলা বাস্তবে প্রদর্শিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে বহু বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে। Rope Trick এই প্রায় অবিশ্বাস্য খেলাটি নিয়ে নানা সময়ে

বিতর্কের ঝড় উঠেছে যে এই খেলাটি সম্পর্কে যে গল্প কথা প্রচলিত আছে সেটি আদৌ কোন যাদুকর দেখাতেন কিনা! বিশ্ব যাদুচক্রে প্রকাশ্যেই জানানো হয় যে, বাস্তবে এমন কোন খেলার অস্তিত্ব ছিলনা। তাঁরা এমনও চ্যালেঞ্জ ছোড়েন যে এই খেলাটি সকলের সামনে যিনি দেখাতে পারবেন তাকে ১০০ guineas দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। Arthur Clau Darby (Kirachi) নামক এক ব্যক্তি তার পুত্রকে নিয়ে এই খেলাটি প্রদর্শনের চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে Kirachi কর্তৃক প্রদর্শিত এই ক্রীড়টিতে তাঁর পুত্র প্রাথমিক ভাবে দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারেন ঠিকই কিন্তু অদৃশ্য হওয়া বা এই খেলার পরবর্তী ধাপগুলি যথাযথরূপে দেখাতে পারেননি। ফলে তাঁকে কোন অর্থমূল্য দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়নি। Kirachi পুনরায় নিজেই ২০০ guineas এর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন সকলের সামনে। খেলার শর্তটি ছিল এ'রকম যে তিনি প্রায় ১০০ ফুট উচ্চতার দড়িটি ছুঁড়বেন এবং তাঁরই পুত্র Kyder ঐ দড়িটি ধরে দড়ির শীর্ষে উঠবেন এবং সেখানে তিরিশ সেকেণ্ড মত অবস্থান করবেন সেই চিত্রটিও যে কেউ গ্রহণ করতে পারেন তখন। প্রমাণস্বরূপ খুব পরিচিত এক প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছ থেকে অত্যন্ত সাধারণ মানের একটি দড়ি সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ একটি পর্যবেক্ষক দল কর্তৃক তা পরীক্ষাও করে নেওয়া হবে এবং পর্যবেক্ষক দল কর্তৃক নির্বাচিত যেকোন স্থানে এই খেলা প্রদর্শনের চ্যালেঞ্জ রাখলেন Kirachi। শুধু তাই নয় জমিতে বিছানো কার্পেটের যে কোন প্রান্তেই বসে থাকবেন দর্শকমণ্ডলী যাতে যে কোন প্রান্ত থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান তাঁরা এবং কোনরূপ কারচুপির অবকাশ যেন না থাকে সেখানে। তবে তার প্রস্তাবনা তৎকালীন বিতর্ককারী দলের দ্বারা গৃহীত হয়নি।

Indian Rope Trick নিয়ে বিশশতকেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি ভারতীয় সংস্কৃতির। ১৯৪১ সালে যাদুকর Joseph Dunnnger ভারতীয় যাদুর দড়ির খেলার কৌশলটি উন্মুক্ত করলেন। তাঁর মতে সম্পূর্ণ প্রযুক্তির সাহায্যে ক্যামেরার কারসাজি করে এই খেলাটি দেখানো যেতে পারে। এরও প্রায় কয়েক দশক পর ১৯৪৫ সালে Nature পত্রিকার নিবন্ধ রূপে প্রকাশিত হল 'Unrevealing the Indian rope trick'। লেখকদ্বয় ছিলেন Richarde Wiseman এবং Peter Lamont অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক আঙ্গিকে এখানে ভারতীয় যাদুতে কীভাবে দড়ির খেলা সংক্রান্ত নানা মতবাদ চালু ছিল তা তাঁরা আলোচেনার প্রতিপাদ্যরূপে দেখিয়েছেন।[১২] Rope Trick সম্পর্কে যে বিভিন্নধর্মী ধারণাগুলি তাঁরা সত্যরূপে হাতে পেয়েছিলেন সেগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির।

এক শ্রেণির দর্শকের অভিমত, এই ধরণের দড়ির ইন্দ্রজালের ক্ষেত্রে যাদুকরের সহকারী দড়িটি ধরে উপরে শীর্ষাংশে উঠে যান এবং সেখানেই খেলাটি শেষ হয়ে যায়। অন্য একপক্ষের অভিমত এক্ষেত্রে সহযোগীটি উপরে উঠে যান এবং অদৃশ্য হয়ে যান পরমুহূর্তে আবার দর্শকের দৃষ্টিগোচর হন। তৃতীয় একপক্ষের এ'বিষয়ে অভিমত আবার দ্বিতীয় মতামতের সঙ্গে অনেকটা মিললেও তাঁরা বলেন সহযোগীটি কিন্তু অবশেষে উদয় হন মঞ্চের অন্য কোন স্থান হতে। পক্ষান্তরে আর এক পক্ষ বলেন যাদুকরের সহযোগীটি অদৃশ্য হওয়ার পর পুনরায় তার অভ্যুত্থান ঘটে প্রেক্ষাগৃহ ভরা দর্শকমণ্ডলীর মধ্য থেকে। শেষ একদলের মতে দড়ি বেয়ে উঠে অদৃশ্য হওয়ার পর যাদুকরের সহযোগীটি এই খেলায় পুনরায় আর কখনই আবির্ভুত হননা। তবে দড়ির খেলার রোমহর্ষক একটি পর্বে যেখানে যাদুকর অদৃশ্য অবস্থায় ক্রোধবশতঃ তার সহযোগীর দেহাংশ ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ করছেন এই তথ্যটি ভিন্ন মতামত প্রদানকারী দর্শক গোষ্ঠীর

কোন পক্ষের নিকট থেকেই কিন্তু অনুসন্ধানে উঠে আসেনি। সব থেকে মজার বিষয় মুখের কথার ইতিহাসের মতই (Oral History) দর্শকেরা তাদের স্মৃতি নির্ভর ঘটনার ভিত্তিতেই এক দশক আগে ঘটে যাওয়ার খেলাটি বর্ণনা করেছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতির দূর্বলতা ও এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সংমিশ্রণে মূল বর্ণনায় কিছু ভুল তথ্যও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনায়াসেই। এ'বিষয়ে Wiseman-এর অভিমত Indian Rope Trick এর বর্ণনা করতে গিয়ে হয়ত অনেকেই ভারতীয় যাদুর অপর একটি ক্রীড়া Busket Trick এর খেলাটির কিছু অংশকে সংমিশ্রিত করে ফেলেছে স্মৃতিচারণ পর্বে। ঐতিহাসিক Mike Dash ২০০০ সালে Wiseman-এর লেখার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখছেন সাধারণ ভাবে গড় চার বছরের ব্যবধানে গৃহীত স্মৃতি নির্ভর তথ্যের মধ্যে তেমন কিছু তফাৎ ঘটেনি। কিন্তু চার দশক পূর্বের ঘটে যাওয়া তথ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালে শ্রোতাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যে আশমান জমিন ফারাক ঘটে গেছে। Oral History র একটা অন্যতম সীমাবদ্ধতা এখানেই যে শেষ ঘটনা বর্ণনা কালের স্রোতে বিবর্তিত হতে হতে যখন নতুন পট ও প্রেক্ষিতে উঠে আসে তখন তার আসল-নকলে অনেক তালগোল পাকিয়ে যায়। এ'ক্ষেত্রেও অনেকটা সেইরকমই ঘটেছিল হয়ত। ফলে তিন চার দশক পূর্বে ঘটে যাওয়া খেলার বিবরণ সময়ের স্রোতে পরিবর্তিত হতে হতে যে নতুন রূপ লাভ করেছিল তার সঙ্গে মূল কাঠামোটির হয়ত কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়না। তাই ভারতীয় জনগণের স্মৃতি নির্ভর বিবৃতির ধারা যে তার মূল বিষয়টি থেকে সময়ের তালে তালে বদলে গেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক সত্যি সংগ্রাহক তথা গবেষকই তাই মনে করেন Rope Trick সংক্রান্ত যে কাহিনি জনসমাজে প্রচলিত আছে তা অনেকটাই কল্পনাশ্রিত সত্য বা মিথ্যা। তাই হয়ত অনেক দশক পরে এই সকল কলাকৌশলের বিস্তৃত খোঁজ খবর করা যখন শুরু হয়, তখন দেখা গেছে খুব সামান্য একটা কলাই জনশ্রুতির দ্বারা এবং তাদের কল্পনার রঙে অত্যন্ত উচ্চমার্গের একটি শৈল্পিক রীতির মর্যাদা পেয়ে গেছে। এই সকল কল্পিতভাবনার কোন রূপ ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি জনসমাজের পক্ষে ফলে স্মৃতি নির্ভর তথ্যগুলি যখন সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে কেনা প্রকার পারম্পর্য বজায় থাকেনি। ভারতীয় যাদুর ক্ষেত্রে তাই Rope Trick এর প্রকৃত স্বরূপটি নিয়ে আজও বির্তকের অবকাশ রয়ে গেছে। ভারতের যাদু মঞ্চে মিথ্যাকে সত্যি করার এই কৌশল নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে। Rope Trick এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে জানা যায় দুটি সমান মাপের গাছ বা সমজাতীয় দুটি স্তম্ভাকৃতি বস্তুর মধ্যে একটিতে তার এর দুই প্রান্ত আট কানো থাকে। খেলাটি যেহেতু রাতে প্রদর্শিত হয়, এই আটকানো তারটিকে সাধারণ ভাবে নজরে পড়েনা। দড়িটিকে এমনভাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয় যাতে দড়ির প্রান্তে লাগানো হুকটি একটি তারে গিয়ে আটকে যায়। আপাতভাবে মনে হয় দড়িটি কোন অবলম্বন ছাড়ায় খাড়া ভাবে দাড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় ঐ দড়িটি ধরে একটি কিশোর বা বালকের ওঠা সহজ হয়। তবে অদৃশ্য হওয়া বা খণ্ড খণ্ড দেহাংশ ছুড়ে দেওয়ার কাহিনিটি যে খেলাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেটি ভ্রান্ত। এই কল্পনাভিত্তিক রোমহর্ষক কাহিনি Rope Trick এর খেলাটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল এশিয়া মহাদেশের প্রেক্ষাপটে। দেশীয় ও বিদেশী Rope Trick সম্পর্কিত প্রথম তথ্য প্রকাশ করে Chicago Tribuna একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত এই খবরটি বহুল জনপ্রচারে সাহায্য করেছিল। Chicago Tribuna-এর লেখকের প্রকৃত নামটি ছিল Peter Lamont। তিনি অবশ্য Fred S. Ellmore এই ছদ্মনামে নিবন্ধটি লিখেছিলেন। ১৮৯০-এর পূর্ববর্তী

সময়ে Rope Trick সংক্রান্ত কোন কৌশল এর কথা যেমন প্রামান্য তথ্য সহকারে জানা যায়না ১৮৯০-এর পরবর্তী পর্যায়ে ইবনবতুতার নিজস্ব বৃত্তান্ত হতে অবশ্য এই খেলাটি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তবে তিনি দড়ির পরিবর্তে এক্ষেত্রে চেন অর্থাৎ ধাতুর তৈরি শেকলের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় তার ব্যাখ্যায় এই যাদুর কৌশল ধ্রুপদী ভারতীয় Rope Trick হতে অনেকাংশেই পৃথক।[১৩]

Peter Lamont এর লিখিত নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে Penn এবং Teller তিনটি পর্ব বিশিষ্ট একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন দূরদর্শন প্রযোজনার জন্য। 'Penn & Teller Magic & Mystery Tour' নামে নির্মিত এই ধারাবাহিকটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রূপে নির্বাচন করা হয় 'Rope Trick' সহ জনপ্রিয় কিছু যাদু। যাদুর নানা কৌশলগত আঙ্গিকটির বিশ্বব্যাপী প্রয়োগের দিকটিকে নিয়ে তাদের একটি গবেষকদল বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক, সনাতনী বিভিন্ন যাদু কৌশল সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ভারতের আগ্রা শহরে তাঁরা যখন উপস্থিত হন, তখন দেখেন এক ফকিরকে কেন্দ্র করে এই 'Rope Trick'-এর খেলাটি প্রদর্শিত হচ্ছে। খেলাটির শেষে তাঁরা লক্ষ্য করেন একটি বালকের দেহ হতে নকল রক্ত মুছে দেওয়া হচ্ছে এমনভাবে যেন তার ধড়ের সঙ্গে অন্যান্য দেহাংশগুলি জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। অনুরূপ এই প্রকৃতির একটি খেলা নিয়ে ইংল্যাণ্ডেও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আসলে Rope Trick নিয়ে নানাবিধ গল্প কাহিনি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকলেও অন্যতম জনপ্রিয় যাদুর কৌশলরূপে এটি যে বিশেষভাবে সর্বজনগ্রাহ্যতা পেয়েছিল তা নিয়ে কোন সন্দেহই নেই। তবে অনেক ক্ষেত্রে তা লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে অতিরঞ্জিত রূপ ধারণ করে মূল কৌশলটিকে অনেক বেশি রঙীন করে তুলেছে। পৃথিবীর যাদুর ইতিহাসে এই খেলাটি বোধহয় পৃথিবীর সকল দেশেই নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে স্থান, কাল, ক্ষেত্র ভেদে অনেক সময়ই এটি তার স্বীয় চরিত্রটিকে বদলে দিয়েছে। এই খেলার সর্বাপক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি অর্থাৎ অদৃশ্য হওয়া কিংবা সহকারীর দেহাংশটি ছিন্ন করে দেওয়ার মত অতি কাল্পনিক কাহিনি নিয়েও বিগত দুই দশক যাবৎ খেলাটি তার স্বীয় জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রেখেছে পৃথিবীর নানা দেশে। Rope Trick আমাদের দেশীয় যাদুর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এ'কথা আগেই বলেছি এছাড়াও আমাদের দেশীয় যাদুর মঞ্চের আরো একটি প্রাচীনতম খেলা হল ভারতীয় 'Busket Trick' অথবা এটিকে বলা হত 'Hindu Busket Trick'।[১৪] এই খেলাটিতে দেখানো হত একটি ঝুড়িতে যাদুকর তার সহযোগীকে ঢুকিয় বন্ধ করে দেন এবং তারপর তিনি ঝুড়িটিকে ছুরি বা তরোয়ালের সাহায্যে আঘাত করে ছুরিটিকে ঝুড়ির এ'পার ও'পার করে ফুঁড়ে দেন অথচ সকলে অবাক বিস্ময়ে দেখে যে তার সহযোগীটি অক্ষত অবস্থায় ঝুড়ির ভিতর থেকে আবির্ভুত হয়েছেন অথবা অনেক সময়ে তিনি দর্শকের মধ্য থেকেই হেঁটে আসতেন। ভারতীয় যাদুর এই কৌশলটি দীর্ঘকাল আগেই পাশ্চাত্য ঘরানার শিল্পীরা অনুসরণ করেছিলেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তা প্রয়োগ করার সময় আংশিক পরিবর্তন পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করে নেওয়া হয়েছে দর্শকের চাহিদানুযায়ী। ভারতীয় যাদুর এই কৌশলটি অনেক যাদুকরই রাস্তায় যাদুর অনুষঙ্গ রূপে দেখাতেন। 'Indian Street Magic' রূপে এই খেলাটি একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই খেলাটিকে বিদেশি যাদুকর Colonel Stodare মঞ্চে যাদু রূপে দেখানোর জন্য গ্রহণ করেছিলেন। Busket Trick এর সনাতনী ধারায় এক সময় ঝুড়ির ব্যবহার-এর যে প্রচলন ছিল তা পরবর্তিকালে বদলে যায়।

বর্তমানকালের যাদুকরেরা আর এই ঝুড়ির ব্যবহার করেন না তাঁরা ঝুড়ির পরিবর্তে আধুনিক সুদৃশ্য বিভিন্ন নক্সাখচিত একটি বাক্স ব্যবহার করেন। মূল প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে অনেকটা একই। বাক্স বন্দী সহযোগীর বাক্সটিকে বাইরে ছুরি বা তরোয়াল-এর সাহায্যে এক প্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে গেঁথে দেওয়া হয়। তরোয়াল গাঁথা বাক্সটি এরপর ঘুরিয়ে দর্শক মণ্ডলীকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের পরে যাদুকর বাক্সটিকে যখন উন্মুক্ত করেন তখন দেখা যায় তার সহযোগী অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসছেন। বাক্স বন্দীর এই কৌশলটিকে কাজে লাগিয়েই নানাভাবে আধুনিক যাদুকরেরা বাক্স নিয়ে দৃষ্টিভ্রম-এর খেলাও দেখান। ভারতীয় যাদুর এক শতক পূর্বেও যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী বাক্সর মধ্যে শেকল বন্দী অবস্থা থেকেই নিজেকে মুক্ত করে দর্শক মণ্ডলীর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতেন।

যাদুর রহস্যময় জগতের পর্দা উন্নীত হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সঙ্গে সঙ্গেই। একসময় যাদুকে ভাবা হত কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রয়োগ। কথাই আছে 'ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে' অর্থাৎ কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার সঙ্গে ফকিরি মন্ত্রতন্ত্রের একটি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে সাধারণ মানুষ কোন ঘটনার পিছনে যে দৈবশক্তির প্রভাবকে বিশ্বাস করে আদৌ তা দৈব না তা হয়ত ঘটছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মেই কিন্তু সাধারণ মানুষ তা কোন বিশেষ ব্যক্তির অধীত শক্তির ফলস্বরূপ মনে করে। যাদু বিদ্যায় সাধনাকেও এক সময় মানুষ কোন বিশেষ দৈবশক্তি প্রাপ্তির সাধনা স্বরূপই মনে করত। বিনোদনী আঙ্গিক থেকে তখন কিন্তু যাদু শিল্পকে দেখা হতনা। ফকিরি মন্ত্রতন্ত্র বিদ্যার উপর তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বিশ্বাস ছিল অগাধ। ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা, রোগব্যাধি উপশমে ফকিরি ঝাড়ফুক বা স্পর্শ দ্বারা যেন নিরাময়ের চেষ্টা করা হত সকল সমস্যার। ভারতীয় যাদুর ক্ষেত্রে ফকিরি বিদ্যার অন্য এক নিদর্শনকেও যাদুর পর্যায়ে ফেলা হত সেটি হচ্ছে অন্যের ব্যাধি উপশমের যেমন ব্যবস্থা করা হত, ঠিক তেমনই ফকির কিংবা সাধুসন্তেরা শারীরিক কোন পীড়া, যন্ত্রণাকে স্বতপ্রণোদিত ভাবে গ্রহণ করে সকলকে দেখাতেন অপরিসীম সহনশক্তির যাদু।[১৫] প্রাচীন যাদুকলার অন্যতম নিদর্শন রূপে যেমন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হেঁটে যাওয়া কিংবা শরীরে সুঁচ বা ধারালো কিছু অস্ত্রের দ্বারা আঘাতপূর্বক দেখানো হত যে শারীরিক এই আঘাত সত্ত্বেও তাঁরা কোনরূপ যন্ত্রণা বা ব্যথা প্রকাশ করতেন না। পূর্বভারতে এই খেলাটি বিশেষ প্রচলিত ছিল যেখানে দেখানো হত এক ফকির সারাদিনই তাঁর দেহে ধারালো ধাতব যন্ত্র ঢুকিয়ে বসে থাকতেন। এই খেলাটিরই পরবর্তি সংস্করণ রূপে আমরা পাই সারা শরীরে সুঁচ বিঁধিয়ে রাখার মত যন্ত্রণাদায়ক একটি কৌশল যার মাধ্যমে এই সকল ফকির কিংবা সাধু সন্তেরা অতিপ্রাকৃত দৈবশক্তির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করত। বিজ্ঞানের যুক্তি দ্বারা অবশ্য এতসকল খেলার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান-এর যুক্তি বলে মানসিক যোগসাধনের ফলে দৈহিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেক বেড়ে যেতে পারে এবং যেকোন প্রকার যন্ত্রণার সংবেদটি মস্তিষ্ক তখন গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষমতা অর্জনে করে। সেক্ষেত্রে দেহে কোন প্রকার আঘাত কিংবা যন্ত্রণার অনুভূতির সংবাদটি স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরণ করা হয়না। মস্তিষ্ক এই সংবাদটি গ্রহণ না করলে স্বাভাবিক ব্যথা বেদনা বা যন্ত্রণার অনুভব সম্ভব হয়না। স্নায়ুতন্ত্রের উপর এই নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘ যোগ সাধনার ফলে সম্ভব যেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি দীর্ঘ সময় যাবৎ ব্যথা বেদনার সংবেদন অনুভব করেন না। ত্বকের ক্ষতিকর অংশটি এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংবেদ তথা খবর

মস্তিষ্ককে পাঠাতে সক্ষম হয়না তবে কেন ও কিভাবে এই যোগ বা মস্তিষ্কের ব্যায়াম করা যেতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানের কাছে এখনও কোন বিশদ ব্যাখ্যা মেলেনা।

ফকিরের সঙ্গে প্রথাগত অর্থে যাদুকরদের এক করে হয়ত দেখা ঠিক নয়। কারণ কিছু কিছু যাদু শিল্পী আজীবন পথে ঘাটে নানা প্রকার অবাস্তবোচিত ঘটনা ঘটিয়েই অর্থ উপার্জন করে গেছেন এবং আজীবন পথেই জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু সকল ফকির আবার যাদু তথা ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না ফলে সকল ফকিরকে যাদু শিল্পী ভাবা বোধহয় ঠিক হবে না। আসলে 'Fakir' কথাটির একটি ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কোন মানুষ ধর্মের সাধক তথা দরবেশ রূপে যখন জীবন যাপন করেন তাকে 'ফকির' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমান প্রচলিত ধ্যান ধারণায় ফকির শব্দটির কার্যকরী প্রয়োগ অর্থাৎ প্রায়োগিক অর্থ কিন্তু অনেকটাই বদলে গেছে। এখন আর ফকির অর্থে ফকির বিশেষ কোন ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকর কিংবা ধর্মীয় সাধক বোঝানো হয়না। বর্তমান ব্যবহারিক অর্থে ফকির অর্থে ভিক্ষুক তথা দরিদ্র শ্রেণিকে বোঝানো হয়। তবে প্রথাগত যাদু শিল্পে এক সময় এদের এক বিশেষ অবদান লক্ষ্য করা গেছে। যদিও তা কতখানি বিনোদনের উদ্রেক করত সে নিয়ে বিতর্ক থেকে যাবে। তবে এঁরা যে একসময় নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটিয়ে মানুষের বিস্ময় ও কৌতুহল বৃদ্ধি করতেন তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় ফকিরি বিদ্যাও তাই যাদুর আলোচনার অনুষঙ্গে আলোচিত হতে বাধ্য। Haward Thurston-এর মত বিদেশী শিল্পীরা ভারতীয় যাদুবিদ্যার নানা আঙ্গিক নিয়ে যখন চর্চা শুরু করেন তখন ফকিরি বিদ্যার কলাকৌশলগুলি সম্পূর্ণ রূপে নস্যাৎ করে তাঁরা বলেন এগুলি যাদুর কোন প্রকার অনুষঙ্গী নয় কারণ এ'ক্ষেত্রে কেবল কিছু শারীরিক ক্ষমতা বা কলাকৌশল দেখানোর প্রচেষ্টা হয়েছে। একটি বীজ থেকে বিশেষ বৃহৎ আম গাছের জন্ম কিংবা Rope Trick বা Busket Trick-এর মত ভারতীয় যাদুর খেলাগুলি বিদেশিরা যখন নিজেদের মঞ্চ ও কৌশলের সাহায্যে প্রয়োগ করেছেন তা অনেক উন্নত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'Bed of Spikes effect' সারা দেহে সূঁচ বিদীর্ণ অবস্থায় শয্যার খেলাটি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। তবে যাদু প্রদর্শনে তাঁরা নানা সময়ে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মঞ্চ উপস্থাপনে অভিনবত্বের ছোঁয়া আনেন। জীবন্ত সমাধির খেলা কিংবা সূঁচবিদ্ধ অবস্থায় শয্যা গ্রহণের খেলার ক্ষেত্রে তারা নানাভাবে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করতেন। ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ Heuri Pieron ভারতীয় ফকিরদের যন্ত্রণা গ্রহণের সক্ষমতার বিষয়টির গবেষণা প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন যে যন্ত্রণা বা ব্যথাদায়ক যাবতীয় অনুভূতি মনস্তত্ত্বের বিচারে একটি কাল্পনিক অনুভূতি। এটিকে এরা মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতা (instinct) রূপে অভিহিত করতে চেয়েছেন। তাদের মতে গুহাবাসী মানুষ অজানা বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে এই প্রবণতার দ্বারা চালিত হতেন। পরবর্তী পর্যায়ে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে অনেক অনুভব অনুভূতি অভিযোজিত হতে থাকে। কাজেই মনস্তত্ত্বের বিচারে সকল প্রকৃতির যন্ত্রণায় একটি কাল্পনিক প্রবণতা যার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নেই। যেকোন প্রকার মানসিক উত্তেজনায় যন্ত্রণার অনুভূতি আসে না। বিশিষ্ট শারীরবিদ্যা বিশারদ ইতালীর ডঃ Lorenzo Gualiano একাধিক অপরাধীর উপর গবেষণা করে দেখেছিলেন আপাতভাবে জ্ঞাত না করে এদের দেহে কোন ধারালো ধাতব বস্তু বা সূঁচের মত কোন সূক্ষ্ম বস্তু বিদ্ধ করা হলে এদের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্রণার অনুভূতি প্রকাশ পায়না।[১৫] অর্থাৎ আপাতভাবে এদের দেহে কোন

প্রকার আঘাত তথা যন্ত্রণার সংবেদ ঘটেনা। এমন ঘটনার নজীর আছে যেখানে একটি অগ্নিদগ্ধ বাড়ি থেকে কোন ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে হয়ত নিচে সমতলে ঝাঁপ দিয়েছে, সেই মুহূর্তে তিনি কিন্তু তখন কোন প্রকার ব্যথা অনুভবই করেননি। কিন্তু খানিক পর আগুন নিভে গেলে তিনি যখন দেখেন তার পায়ের একটি আঙুল থেকে নখ সম্পূর্ণ উঠে গেছে, তখনই কিন্তু তার ব্যথার অনুভূতি শুরু হয়। আসলে অগ্নি দুর্ঘটনা ও প্রাণ বাঁচানোর যে মানসিক উত্তেজনায় তিনি ছিলেন তার ফলস্বরূপ সাময়িক ভাবে কোনরকম ব্যথা অনুভূত হয়নি। মানসিক উত্তেজনার কারণটি অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিটি যখন স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসেন তখন এই যন্ত্রণার সংবেদটি ঘটে। শুধু তাই নয় Anatomist রা আবিষ্কার করেছেন যে মানুষের ত্বক হতে যে কোন প্রকার সংবেদ নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র কর্তৃক মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারেনা। সাধারণ ভাবে ৬০ সেকেণ্ডের বিরতি নিয়ে যন্ত্রণার সংবেদটি নির্দিষ্ট ধাপে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় এগিয়ে যায়, আবার কিছু ক্ষেত্রে এটি মস্তিষ্কে পৌঁছাবার পূর্বেই কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রেই হারিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ব্যথার কোন সংবেদ বা অনুভূতি বাহ্যিকভাবে অনুভবের কোন সম্ভাবনায় আর থাকেনা। ফলে যে সকল ক্রীড়াকে আমরা অতিপ্রাকৃত আশ্চর্য শক্তির পরিচায়ক রূপে জানি সেগুলির যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও হয়েছে নানাভাবে। বিজ্ঞানীদের মতে কিছু কিছু বিশেষ শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে মন সম্পূর্ণ রূপে যে কোনপ্রকার ব্যথা তথা যন্ত্রণার অনুভবকে উপেক্ষা করতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন মন স্বতপ্রণোদিত ভাবেই স্নায়ুকোষে বার্তা প্রেরণে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি কোন ব্যতিক্রমী ঘটনাও নয়। বিশেষ প্রকৃতির Hysterie জাতীয় অসুখের ক্ষেত্রে এইরূপ লক্ষণ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। অনেক সম্মোহনকারী নাটকীয় কায়দায় Hysterie-এর এই প্রকৃতিটিকে সম্মোহনকলার অনুষঙ্গ রূপে ব্যবহার করেন।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যখন ডাইনী প্রথার প্রচলন ছিল তখন একটি বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তিটির সারা অঙ্গে সূঁচ বিদীর্ণ করে দেখা হত যদি সেই ব্যক্তির বিদ্ধ হওয়ার কোন প্রকার যন্ত্রণা তথা ব্যথার অনুভব প্রকাশ না ঘটত সেক্ষেত্রে তাকে ডাইনী রূপে অভিযুক্ত করা হত। বহু বিদেশি তথা ভারতীয় সাধুসন্তদের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস বা আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা নানা অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত কাজে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেখাতেন। সেন্ট সেবেষ্টাইন সারা দেহে তীরবিদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘসময় থাকতে পারতেন এক্ষেত্রে আপাত ভাবে তাঁর মধ্যে কোনরূপ ব্যথা বা যন্ত্রণার বঃহিপ্রকাশ ঘটত না। সেন্ট লরেন্স সম্পর্কেও জানা যায় তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার শয্যায় রাখা হলেও তিনি সেই সময় তার শিষ্য ভক্ত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কৌতুক, ধাঁধা তামাশায় মেতে থাকতেন। এই ক্রিয়াকৌশলকে একসময় ম্যাজিক-এর মত মনে হলেও বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শরীরবিদ্যা বিশারদগণ প্রমাণ করেছেন যে, এই যন্ত্রণাহীন অবস্থা আসলে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনার ফসল কিংবা তা বিশেষ প্রকৃতির Hysteria-র বৈশিষ্ট্য। কিছু বিশেষ জাতির মধ্যে নানাপ্রকার ব্যথা বেদনা যন্ত্রণা উপশমের জন্য বিশেষ প্রকার যোগ বা অভ্যাস–এর অনুশীলন করার চর্চা শুরু হয়। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি, মঙ্গোলীয়, এশিয়ান, এশীয় হিন্দু এবং এস্কিমোদের মধ্যে দেখা গেছিল সাময়িক ভাবে তারা যে কোন প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা তথা ব্যথার সংবেদকে আটকাতে সমর্থ হতেন দীর্ঘ যোগাভ্যাস ও শারীরিক চর্চার সাহায্যে। পার্শি ও তুর্কিতে ধর্মীয় আন্দোলন থেকে উদিত সুফীবাদ ও হিন্দু দর্শনের যোগ চর্চায় সম্মোহনবিদ্যার সাধনা

ও তার শক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ভারতীয় ও বিদেশী ইন্দ্রজালবিদরা সকলেই নানা সময়ে এই সম্মোহনবিদ্যার চর্চা করেছেন এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগও ঘটিয়েছেন মঞ্চ এবং মঞ্চের বাইরেও।[১৬] ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে সম্মোহনবিদ্যাকে এক বিশিষ্ট মাহাত্ম্যা দান করেছেন হিন্দু যোগসাধকেরা। শিবকেও মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী রূপে বন্দিত করা হয়েছে হিন্দু শাস্ত্রীয় চর্চায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ, যোগ ও ধ্যানের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল কিছু উপর যে নিয়ন্ত্রণ সাধন সম্ভব, সেই ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অনেক যোগী পুরুষ তথা হিন্দু সাধক দীর্ঘদিন এই বিদ্যার সাধনা করে গেছেন। সম্মোহন বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বহু সাধক পুরুষ নানাভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে গেছেন। সে সাধক যোগী থেকে শুরু করে পীর দরবেশ প্রত্যেকেই ধর্মীয় ভাবাদর্শকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য হলো সেখানে মহিলা সাধক বা যোগীরূপে তেমন কেউ উঠে আসেননি। পুরুষেরা যে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের যোগী তথা সাধক রূপে দাবি করতেন পক্ষান্তরে কোন মহিলা যদি কোনরূপ অতি প্রাকৃত আচরণের প্রকাশ ঘটাতেন তাকে 'ডাকিনী' 'যোগিনী' অথবা ডাইনী রূপে অভিযুক্ত করা হত এবং পরিবার আর সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হত। চিরকালই নারীর অধীত শক্তি প্রকাশকে ভারতীয় সমাজে অশুভ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। Howard Thurston-এর অভিমত আবহমান কাল ধরে ভারতীয় বিনোদন সংস্কৃতিতে হাজার হাজার যোগী সাধু কিংবা যাদুকরের জন্ম হয়েছে কিন্তু তাদের ক্রিয়াকর্ম তথা কৌশল অভুতপূর্ব কোন ঘটনার সাক্ষ্য বহন করেনি। বরং তাঁরা খুব সহজ সরল প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁদের ক্ষমতা প্রদর্শনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা করতেন এমন ভাবে যে বিশেষজ্ঞ দ্বারা অনায়েসেই সে রহস্য উম্মোচন করা সম্ভব হত। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্মোহনবিদ্যা চর্চার ইতিহাস অতি পুরাতন। কিন্তু এই চর্চায় সকলে তেমন ভাবে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। পাশ্চাত্যে যাদুর কৌশলে এমন উন্নত ভাবনার প্রয়োগ করা হত এবং তা অত্যন্ত দক্ষ ও অভিনব প্রয়োগ কৌশলরূপে সমাদৃত হত। কিন্তু আমাদের দেশের খুব স্বল্প সংখ্যক যাদুকরই দেশীয় যাদুর কৌশল ও সম্মোহন কলাকে একটি সুনির্দিষ্ট মার্গে উন্নীত করতে সমর্থ হন।

ভারতীয় যাদুর একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা হল 'Mango Tree Trick' এই খেলাটি বহু যাদুকর তাদের প্রদর্শনীতে দেখিয়েছেন। খেলাটির বৈশিষ্ট্য হল এক্ষেত্রে একটি কাপড়ে মুড়ে দর্শককে একটি আমের বীজ দেখানো হয়। এর পর এই চারাটিকে পুঁতে দেওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে কাপড়ের অংশটি সরানো হতে থাকে এবং দেখা যায় চারাটি আসতে আসতে বড় হচ্ছে। যাদুকর এ'ভাবে পরতে পরতে এক একটি কাপড়ের টুকরো সরাতে থাকেন এবং চারাগাছের দৈর্ঘ্যটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরিশেষে শেষ কাপড়টি সরাতেই ২-৩ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি আমগাছের চারা দর্শক প্রত্যক্ষ করেন। এই খেলাটির কৌশলটি আসলে এরকম যে এ'ক্ষেত্রে যাদুকর অনেকগুলি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের গাছের চারা সংগ্রহ করে রাখেন এবং সংগ্রহ করে রাখেন সমপরিমাণ কাপড়ের কিছু টুকরো যার সাহায্যে চারাগুলি আড়াল করে রাখা হয়। যে পাত্রে বীজটি বপন করা হয় সর্বাপেক্ষা স্বল্প দৈর্ঘ্যের চারাটি প্রদর্শনের পর তিনি কৌশলে কাপড়টি আড়াল করার সময় ছোট চারাটি সরিয়ে দ্বিতীয় বড় চারাটি রোপণ করে দেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় কাপড়টি সরিয়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ চারাটি দর্শককে দেখানো হলে পুনরায় কাপড় দ্বারা দ্বিতীয় চারাটি ঢেকে দেওয়ার ছলে সেখান থেকে দ্বিতীয়টিকে সরিয়ে তৃতীয় দীর্ঘচারাটি বসিয়ে দেওয়া

হয়। এইভাবে শেষ অবধি যাদুকর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘচারাটি দর্শককে দেখিয়ে বীজ হতে মুহূর্তে বড়সড় আমের চারার বিকাশের খেলাটি দেখিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে এই খেলাটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রাচীন একটি খেলা। আরো পরিণত ও উন্নত উপায়ে যাদুকরেরা এই খেলাটি দেখিয়ে থাকেন যেখানে পূর্ব হতেই জমিতে একটি আমগাছে স্বল্প দৈর্ঘ্যের চারা পুঁতে রাখা হয় এবং উপর থেকে কিছুটা মাটি ছড়িয়ে মূল উৎস মুখটি ঢেকে দেওয়া হয়। উপস্থিত দর্শকবৃন্দের সামনে একটি আমের বীজ পুঁতে দেওয়া হয় ঐ উৎসমুখটিতে এবং উপর থেকে একটি কাপড় বা তাঁবুর মত কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এরপর বীজটিতে জল দেওয়ার মত করে কাপড়টির উপর থেকে জল ছড়ানো হয়। এই জলটি মূল উৎসটিতে পড়লে গাছ-এর চারা ভূমিতে উত্থিত হয়ে আসে। এ'ক্ষেত্রে আসলে চারাগাছটি যেখানে পুঁতে রাখা হয় তার উৎসমুখটি একটি cork-এর সাহায্যে আটকানো থাকে। ফলে জলটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎস মুখটি খুলে যায় এবং গাছটির চারাটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। যাদুকর কাপড়টি সরিয়ে নেন ধীরে ধীরে এবং চারটি গর্ত থেকে পুরোটায় উঠে আসে। আসলে একই খেলা নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রদর্শিত হয়েছে আমাদের দেশে। কখনও সাধুসন্ত বা ফকির দরবেশের হাত ধরে কখনও আবার প্রশিক্ষিত যাদুকরের হাত ধরে সাধারণ মানুষ এই ধরণের বিনোদনী স্বাদ পেয়েছেন।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করাই ইন্দ্রজাল।[১৭] ভারতীয় যাদুর অপর একটি অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় বিনোদনী অনুষঙ্গ রূপে দেখানো হয় ভাতের পাত্র হতে চাল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মত অলৌকিক ঘটনা। যাদুকর Thurston এই খেলাটির রহস্যও উন্মোচিত করেন। আপাতভাবে দেখানো হয় একটি পাত্রে ভর্তি চাল ম্যাজিশিয়ানের যাদু বলে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং চাল ভর্তি পাত্রটি পাশে একটি গাছের ডালে ঝুলতে দেখা যায়। খেলাটির প্রকৃত রহস্যটি হল একটি তারের কাঠামো নির্মাণ করা হয়। পাত্রের আকৃতিতে নির্মিত এই তারের কাঠামোটির বাইরের অংশটিতে মাটির প্রলেপ দেওয়া থকে এবং পাত্রটি এমনভাবে বার্নিশ রঙ-এর কারুকার্য ও প্রলেপ দেওয়া থাকে যেন মনে হয় এটি কোন কাঁচের পাত্র। পাত্রটির মুখে একটি সমান মাপের থালা বসানো হয় এবং থালাটিতে পরিপূর্ণ করে চাল ছড়ানো থাকে এমনভাবে যেন মনে হয় পুরো পাত্রটি চালে ভর্তি করা আছে। দর্শকের চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য এমনটা করা হয়। এরপর পাত্রটি একটি কাপড় দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করার পর তিনি পাত্রটি ঐ স্থানে আছে কিনা তা দেখার জন্য লাফিয়ে পাত্রটির উপর ঝাঁপান এবং কৌশলে মাটি সহ তারের কাঠামোটি ভেঙ্গে দেন। পাত্রের নিচেও একটি কাপড় রাখা থাকে কিন্তু আপাত ভাবে মনে হয় পাত্রের উপরের অংশে ঢাকা দেওয়ার জন্য কেবল একটি কাপড়েরই ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে পাত্রটি ভেঙে ফেলার পরে কৌশলে তিনি নিচের কাপড়ে পড়ে থাকা পাত্রটির ভগ্নাংশ ও চালসহ তাদের কাঠামোটি মূল কাপড়টির সঙ্গে তুলে নেন। দর্শক দেখেন মূল জায়গা থেকে পাত্রটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেটি আসলে তখন ভগ্ন অবস্থায় কাপড়ের আড়ালে আছে যাদুকরের হাতে। এই সময় তার সহযোগীটি পাশের গাছে ঝুলতে থাকা আসল চালের পাত্রটির দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই রকম বহু খেলার পিছনে লুকিয়ে আছে নানা বিজ্ঞানসম্মমত কৌশল যা নানাভাবে আমোদিত করেছে মানুষকে। ভারতীয় যাদুর আরো একটি ছোট ও মজাদার কৌশলরূপে দেখা হত একটি বালকের মাথায় একটি নলাকার পাত্র রেখে পাত্রটিতে কেরোসিন তেল পূর্ণ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। পাত্রটি তার

মাথায় থাকলেও আগুনের ফলে তার কোন ক্ষতি হয়না। এই খেলাটির মূল কৌশলটি লুকিয়ে আছে নলাকার বিকারটির ভিতর। আসলে বিকারটির ভিতর একটি ক্ষুদ্রাকার মটকা একটি বৃত্তকার থালার উপর বসানো থাকে। ফলে তেলটি সম্পূর্ণ বিকার পূর্ণ না করে কেবল মটকাটি পূর্ণ করে। বিকার তথা পাত্রের নিম্নতলে কোনপ্রকার তেল বা অগ্নি বিন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে বালকটির মাথায় কোন রূপ আগুনের তাপ পৌঁছয় না।

বিদেশী যাদুকর Thurston আরো একটি জনপ্রিয় খেলার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন খেলাটি ছিল অনেকটা এরকম-বামহস্ত প্রসারিত একটি মূর্তি দর্শকের সামনে বসানো হত। মূর্তিটির বাম হাতে ধনুকটি লাগানো হতো এবং ছিলার সঙ্গে পরানো হত তীরটি। তীরের শেষ প্রান্তটি ডান হাতটির মাধ্যমে ধরে রাখার ভঙ্গিমায় এমনভাবে রাখা হত যেন যাদুকরের নির্দেশ মত মূর্তিটির হাত থেকে তীরটি নিক্ষেপিত হবে। কয়েক মুহূর্ত অতিক্রান্ত হলে যাদুকর নির্দেশ দেওয়া মাত্রই মূর্তিটির হাত থেকে তীরটি নিক্ষেপিত হত নিশানার গায়ে এবং বেশ কয়ে ফিট দূর থেকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মূর্তিটি নিশানার গায়ে তীরটি বিদ্ধ করত। এই আশ্চর্য খেলাটির সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে মূর্তিটির ডান হাতের মধ্যে। তীরের শেষ প্রান্তটি মূর্তির ডান হাতের সঙ্গে লাগানো থাকত একথা আগেই বলেছি। এক্ষেত্রে যাদুকর আসলে চর্বিজাতীয় একটি আঠালো বস্তু সেটি আসলে মোমবাতি কিংবা রঙ প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা হয় (WAX) এই রাসায়নিকটির সাহায্যে ডান হাতের সঙ্গে তীরটি শেষ প্রান্তটি সাময়িক আটকে রাখতেন। আগেই বলেছি তীরটি ধনুকটি পরানোই থাকত শুধু কিছু সেকেণ্ড-এর জন্য রাসায়নিকটির সাহায্যে তীরটি ডান হাতে আটকে থাকত। যাদুকর লক্ষ্য করতেন রাসায়নিকটির আঠাটি যখন আসতে আসতে ছেড়ে যাচ্ছে তখনই তিনি মূর্তিটিকে নির্দেশ প্রেরণ করতেন সহসা মূর্তিটির হাত থেকে তীর নিক্ষেপিত হত। আসলে তীরটি নিক্ষেপিত হওয়ার বিষয়টি এই রাসায়নিকটি প্রয়োগ করে আটকে রাখা হত। ভারতে এসে Thurston Rope Trick এর খেলাটিকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে দেখিয়ে গেছেন। একটি দড়ি উপরের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার পর সেটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এরপর তিনি দড়িটিকে নির্দেশ করতেন মাটিতে গুটিয়ে যেতে। যাদুকরের নির্দেশ পেয়ে দড়িটি মাটিতে গুটিয়ে পড়ে যেত। কেমন ভাবে সম্ভব হত এই খেলাটি? এক্ষেত্রে কিন্তু দড়ির মধ্যে সুকৌশলে বিন্যস্ত করা থাকত কিছুটা নমনীয় প্রকৃতির অ্যালুমুনিয়াম তার। এই তারটি কিছু সময়ই কেবল শক্ত হয়ে থাকতে পারে। তারপরই সেটি নমনীয় হলে গুটিয়ে যায় ফলে দড়ির ভিতর তারটি বিন্যাস-এর ফলে দড়িটি কিছুক্ষণ খাড়াভাবে থাকতে পারে তারটি নমনীয় হয়ে পড়লে দড়িটির স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী দড়িটি গুটিয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ভারতীয় যাদু তথা মন্ত্রতন্ত্রকলার অন্য এক নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতীয় সর্পবিশারদের খেলাগুলির মাধ্যমেও। রাস্তায় সাপুড়েরা বিন বাজিয়ে সাপকে বশীভূত করে নানাবিধ ক্রিয়া কৌশল দেখাতেন গ্রাম ও শহরের পথে ঘাটে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রজালবিদ্যার সঙ্গে এই প্রকৃতিটির কোননরূপ সম্পর্ক না থাকলেও এটিও একপ্রকার বশীকরণ তথা সম্মোহনবিদ্যার অঙ্গরূপেই বিবেচিত হত। পরবর্তিকালে অবশ্য বন্যপশু সংরক্ষণ আইনের মাধ্যমেই এই সকল জীবজন্তু নিয়ে খেলা দেখানো একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ভারতীয় হিন্দু তন্ত্র সাধনা কিংবা যাদুবিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে বহু পুরোনো কাল থেকে সাপ নিয়ে খেলা দেখানোর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার চল ছিল। Dr. Raymon L. Ditmars-এর মতে প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে

ঊনপঞ্চাশজন সর্পবিশারদও যে কোবরা নিয়ে খেলা দেখাতেন সেগুলির দাঁত ও সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক বিষটি বার করে নেওয়া হত। তবে ব্যতিক্রমস্বরূপ এক দু'জন সম্পূর্ণ বিষধর কোবরার সঙ্গে খেলা দেখাতে পারদর্শী ছিলেন। কীভাবে তাঁরা এই বিষধর প্রজাতির সাপের সঙ্গে খেলা দেখাতেন তা আজও এক বড় বিস্ময়। শুধু যে ব্যক্তি খেলাটি দেখাতেন তিনিই নন, তাঁর পরিবারের নাবালক সদস্যটিও এই বিষধর প্রাণীটির সঙ্গে থাকতে থাকতে যেন অভিযোজিত হয়ে যেত। অনেক সময় সর্প দংশনজাত কিছু শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির বিরুদ্ধে এদের অভ্যন্তরীন প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। ফলে এই সকল সাঁপুড়ে পরিবারগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ বিষধর প্রাণীটির সঙ্গে সাবলীলভাবে সহাবস্থান করতে পারে, যা আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এগুলি তারা কোনপ্রকার তন্ত্রমন্ত্র বা ঐশ্বরিক বিদ্যা দ্বারা সাধন করত না। বরং বিজ্ঞানসম্মত কিছু কৌশল ও জীবন যাত্রার কিছু ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা নানা কঠিন ঘটনাগুলি উপস্থাপিত করত। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলা হয় সম্মোহনবিদ্যার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়ে মানুষের মস্তিষ্ক তথা মনের উপরে। পক্ষান্তরে অন্য কোন প্রকার জীবজন্তু, পাখি, সরীসৃপকে সরাসরি সম্মোহিত করা যায়না। মানুষ উন্নততম প্রাণী, তাই মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্যের কারণে সম্ভবত এই মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াটির পূর্ণাঙ্গ ও সফল প্রয়োগ অন্যান্য পশু, পাখির উপর সম্ভব হয়না। কাজেই ইন্দ্রজালবিদ্যার অন্যতম আনুষঙ্গিক যে সম্মোহনবিদ্যা তার প্রয়োগ পশু পাখির উপর করা হয়ে থাকে এটা ঠিক নয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধতি যাদুকরেরা অবলম্বন করেন। সেটি সাধারণত পাখি জাতীয় প্রাণীর উপরই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। এক্ষেত্রে একটি পাখিকে টেবিলের উপর রেখে তার মাথাটি টেবিলের সমতল অংশের দিকে ঝুঁকিয়ে তার ঠোঁটের সম্মুখ বরাবর একটি চকের সাহায্যে একটি সোজা লাইন টেনে পাখিটির চোখ সেই লাইন বরাবর নিবদ্ধ করে রাখা হলে কিছুক্ষণের জন্য জীবটির স্থবির হয়ে পড়ে এবং মনে হয় সে সম্মোহিত অবস্থায় আছে। এই কৌশল প্রয়োগ করে অনেকক্ষেত্রেই যাদুকরেরা মঞ্চে ব্যবহৃত পশু পাখিকে অন্য কোন খেলা চলাকালীন স্থির রাখেন। কখনও কখনও দুটি হাতের তালুতে পাখির মাথাটি ঘষলেও খানিক সময়ের জন্য জীবটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পশু পাখি বশের যে ভঙ্গিটির যাদু শিল্পীরা প্রয়োগ করে থাকেন সেটির মধ্যে আসলে খানিকটা অতিনাটকীয়তা থাকে। বিন বাজিয়ে সাপকে যে সুরের তালে তালে নাচানো হয়, সেটিও আগাগোড়া একটি ভুল ধারণা। শুধু সাপ কেন কোন জীবেরই সঙ্গীতের সুর অনুসরণ করার মতো ক্ষমতা নেই। সাপুড়ে তথা যাদুকর যখন বিনটি বাজান তখন তিনি নিজেও প্রবলভাবে মাথা বা শরীরটি দোলাতে থাকেন। আসলে তার এই শারীরিক বিভঙ্গকে অনুসরণ করে জীবটিও নড়তে থাকে। আমরা ভাবি সাপ বুঝি বাঁশি বা বিনের তালে তালে ছন্দ অনুযায়ী নড়ছে। আসলে এক্ষেত্রে দৈহিক বিভঙ্গটাই তাদের কাছে ইঙ্গিতবাহী। বাঁশি বা অন্য কোন যন্ত্রানুষঙ্গটি উপলক্ষ্য মাত্র। বলা যায় সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল। অনেক সময় এই কৌশলগুলিকেই আমরা অতিপ্রাকৃত ভাবি। যাদুর প্রায়োগিক সাফল্য এখানেই। নিখাদ মনোরঞ্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম হল ইন্দ্রজাল বিদ্যা তথা যাদুর প্রদর্শন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বহুবিধ আঙ্গিকে এই বিদ্যাটি নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কখনও ধর্মীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে কখনও আবার লোকসমাজের মনন অনুযায়ী, কখনও আবার সম্পূর্ণ প্রযুক্তির সাহায্যে বা জীবজন্তু সাহায্যে। জীবজন্তুর কিছু অভ্যাসগত প্রতিবর্ত ক্রিয়াকেও যাদুর কৌশলের অনুষঙ্গ রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এক পর্যটক যেমন নিয়মিতই তার বাড়ির সন্নিকটে অবস্থিত চিড়িয়াখানার ভালুকগুলিকে বাদাম খাওয়াতেন। নিয়মিত একই ব্যক্তির নিকট হতে এই প্রাপ্তি ভালুকগুলি অনুধাবন করতে পারে। তারাও বিশেষ ভঙ্গিমায় ব্যক্তিটির কাছ থেকে হাত পেতে বাদামগুলি নেয় এবং অভিবাদন জানায়। এটি কোন নির্দেশ বা যাদুবলে হয়না বরং তারার কিছুটা সহজাত ভাবেই প্রকাশ ভঙ্গিমাটা শিখে গেছে। অন্যদিকে Dr. Ditmars তাঁর গবেষণালব্ধ ফলে দেখেছিলেন যে এমন কিছু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আছে, যেমন সেতার, ম্যাণ্ডোলিন, যার সুর সরীসৃপ তথা সাপ জাতীয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোবরা প্রজাতিরা সেতার বা ম্যাণ্ডোলিন এর বিশেষ একটি রাগ দ্বারা ভীষণভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়ে এবং এক্ষেত্রের তাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রভাব পড়ে। ভারতীয় যাদুর বৈচিত্র্যময় নানা দিক নিয়ে গবেষণায় উঠে এসেছে এই সব চমকপ্রদ তথ্য। কখনও বা ফকির, সাধু, যোগী, দরবেশরা নানা কৌশলে মানুষকে নিজেদের শক্তি দেখিয়ে ঠকিয়েছেন।[১৮] কখনও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে নানাবিধ অলৌকিক কলাকৌশলের। কখনও আবার গ্রাম-শহরের পথেঘাটে যাদুর কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে নানা জীবজন্তুকেও। তাই এক্ষেত্রে বিচিত্র বিনোদনী খোরাকের অভাব ঘটেনি কখনও। দেশীয় সাংস্কৃতিক ভিত্তির সঙ্গে যেহেতু ধর্মভারটি আমাদের দেশে আবহমান কালধরে বরাবর গুরুত্ব পেয়ে এসেছে, ধর্মের মোড়কে তাই নানা রকম মন্ত্রতন্ত্রকে যাদু কৌশলের হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। এক সময় নেহাৎ বুজরুকি তথা লোক ঠকানোর উপায় রূপে চর্চিত এই কৌশলটিই কালের ধারায় উৎকৃষ্ট শিল্পকলার স্বীকৃতি পায় স্বনামধন্য যাদু শিল্পীদের হাত ধরে। প্রথাগত ও অপ্রথাগত খেলার অনুষঙ্গ রূপেই খুব সাধারণ কিছু খেলায় ভারতীয় যাদু শিল্প রূপে বিনোদনী মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছে সারা জীবনের জন্য। তবে দেশীয় যাদু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বরাবরই আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। দর্শক আনুকূল্যই ছিল শিল্পীদের প্রধান ভরসা এবং এই শিল্পের ক্ষেত্রে বিগত দুই শতকেই কোন মহিলা শিল্পী যাদুকর হিসাবে উঠে আসেননি। পুরুষ শিল্পীদের মত তাঁরা কখনই কোনরূপ অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। সমাজই সেই অনুমোদন দেয়নি। অতিপ্রকৃত ও দৈব শক্তির প্রকাশের অধিকার কেবল পুরুষদেরই ছিল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বদল শুরু হয় ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে তখনই মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলোর স্পর্শ পেলেন। কিন্তু সামাজিক ভাবে যাদু, নাটক, থিয়েটারের মত বিনোদনী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার স্বাধীকার তখনও তাঁরা পাননি। সেই কারণেই পীর সাধু দরবেশ বা যোগীর ভূমিকায় মেয়েদের কথা তেমন জানা যায়না। প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতীয় যাদু স্বতন্ত্র একটি বিনোদনী মাধ্যমরূপে জনমানসে স্বীকৃতি লাভ করেনি বরং অন্যান্য শিল্পী মাধ্যমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েই স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। তবে সময় মত এগিয়েছে ভারতীয় যাদু পৃথকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছে। ১৯৬১ তে প্রতুলচন্দ্র পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান। ভূষিত হন দ্য স্ফিংস সম্মানে, ম্যাজিক দুনিয়ায় যা অস্কারের সমতুল্য। ভারত সরকার এই সেরা ঐন্দ্রজালিকের নামাঙ্কিত একটি সরণি চিহ্নিত করেছেন এই শিল্পকলাকে স্বীকৃতি জানিয়ে। বিগত তিনদশকে বিনোদন জগতে যাদুর একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলেও প্রযুক্তি নির্ভর অন্যান্য বিনোদনী ধারাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যাদুর কৌলিন্য আজ তবু ম্লান। হারিয়ে যাচ্ছে পেশাদারী যাদু চর্চার আগ্রহও। একেবারেই পরিবারকেন্দ্রিক ভাবে এই শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন কিছু শিল্পী সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। এক শতক

অতিক্রান্ত তবু এ' শিল্পের ভবিষ্যত কিছুটা তমসাচ্ছন্ন। একসময় গ্রাম শহর নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণির সকল বয়সের মানুষকে আকৃষ্ট-আবিষ্ট করে রেখেছিল যে সনাতনী বিনোদনী ঘরানাটি তার সুদিন ফেরার অপেক্ষাই থাকলাম আমরা।

পাদটীকা

১। Satyajit Ray, **'Hirak Rajar Deshe',** Satyajit Ray Film and Study Centre.

২। সংবাদ প্রতিদিন, **'পি. সি. সরকার ১০০',** ২০শে মে, ২০১২।

৩। ঐ সংস্করণ।

৪ । ভগীরথ মিশ্র, **'ঐন্দ্রজালিক',** দেজ, পাবলিশিং, ডিসেম্বর, ২০১০।

৫। পি.সি. সরকার, **'ইন্দ্রজাল',** দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জুলাই, ২০১২।

৬। www.H:magician2.htm

৭। file : H:magician

৮। file : H:magicina

৯। ঐ উৎস।

১০। file : H:/Indianrope-trick.htm

১১। ঐ উৎস।

১২। ঐ উৎস।

১৩। ঐ উৎস।

১৪। file : H : Indian_basket_trick.htm

১৫। পি. সি. সরকার, '**হিপ্নোটিজম',** দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯।

১৬। পি. সি. সরকার, **'মেসমেরিজম',** দীপ প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর, ২০০৬।

১৭। পি. সি. সরকার জুনিয়ার, **'প্রদীপের পাঁচালি',** পত্রভারতী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১৮। 'আনন্দবাজার পত্রিকা, **'বাবা-বাবা খেলা দিয়েই হয়েছিল আমার ট্রেনিং',** ১২ই অক্টোবর, ২০১৭।